সাত সমুদ্র পারে

বিজয়কুমার রায়, এম. এ., বি. এসসি,
(ইউ. এস. এ. ও অক্সফোর্ড)
কনজারভেটর অফ ফরেস্টস।

॥ পরিবেশক ॥
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রা) লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৭

প্রকাশিকা ॥
শ্রীমতী শেফালি রায়
'শিউলি-বাড়ি'
৫০১, ল্যান্সডাউন রোড
কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর ॥
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডা
আদি-মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী ॥
শ্রীচিত্ত দাস

প্রকাশিকার কথা

আজ থেকে ছেষট্টি বছর আগে ১৯০৮ সালে যখন আমাদের দেশে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সমাজে নিষিদ্ধ ছিল, তখন গ্রন্থকার জ্ঞানার্জন ও জীবিকার্জনের জন্য 'সাত সমুদ্র তের নদী' পেরিয়ে জাপান আমেরিকা ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ পরিক্রমা করেছিলেন।

১৯৫৮ সালে বাল্যের ও যৌবনের স্মৃতিচারণ করে এই আত্মজীবনী তিনি লেখেন। সম্পূর্ণ জীবনী লেখার ইচ্ছা হয়তো তাঁর ছিল কিন্তু নানা কারণে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তিনি তাঁর এই পাণ্ডুলিপির প্রকাশ না দেখেই ১৯৬৪ সালে 'এমন দেশে গেলেন, যেখান থেকে কোন ভ্রমণকারী আর ফিরে আসে না।'

তাঁর অদম্য উদ্যম ও অক্লান্ত জীবন-সংগ্রামের কাহিনী বর্তমান কালের কিশোর ও যুবকদের অনুপ্রাণিত করবে এই আশায় তাঁর পরলোক গমনের পরে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হিসাবে আমি পাণ্ডুলিপি প্রকাশে আগ্রহী হই।

সর্বজন শ্রদ্ধেয়া সুবিখ্যাত-লেখিকা শ্রীআশাপূর্ণা দেবী তাঁর নিরলস সাহিত্য-কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করে গ্রন্থকারের পরিচিতি লিখে দিয়েছেন। সেজন্যে তাঁর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

বর্তমান কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা, বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ইত্যাদি নানা বাধার মধ্যে এই গ্রন্থ আমার মতো মহিলার পক্ষে প্রকাশ সম্ভব হতো না, যদি সুসাহিত্যিক শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষের আন্তরিক যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম এই বিষয়ে আমি লাভ না করতাম। তাঁকে আমার অজস্র ধন্যবাদ জানাই। ইতি

'শিউলি-বাড়ি'
২০১, ল্যান্সডাউন রোড
কলিকাতা-২৯

শেফালি রায়
২রা অক্টোবর, ১৯৭০

পরিচিতি

পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই কত মানুষ আসছে যাচ্ছে, পুষ্ট হচ্ছে পৃথিবীর জল-মাটি আলো-বাতাসে, কিন্তু সেই ধাত্রী ধরিত্রীকে জানবার আগ্রহ ক'জনের থাকে? থাকলেও ক'জনের থাকে সেই আগ্রহ চরিতার্থের চেষ্টা? ক'জন আকাশের স্বাদে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে ওঠে, 'থাক্‌ব না আর বদ্ধ ঘরে, দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে!'

অধিকাংশ জনই বলেনা।

তারা পরিবেশের সঙ্গে আপোস করে নিয়ে দিনের দেনা শোধ করে চলে।

কিন্তু, অসংখ্যের মধ্যে থাকে 'কিছু সংখ্যক', সাধারণের মধ্যে 'সাধারণোত্তর'। তারা সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে নিয়ে আসে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, অদম্য কর্মশক্তি, অনন্ত জিজ্ঞাসা। তারা দেখতে চায়, জান্‌তে চায়, বুঝতে চায়, বাঁচতে চায়।

হ্যাঁ, বাঁচার মতো বাঁচতে চায়।

সেই বাঁচার লড়াইয়ে 'জয়কে' তারা জয় করে নেবেই পণ করে হয়তো ঘর ছাড়ে, ছাড়ে অনিশ্চয়তায় ভীতি। কোনো রকম প্রতিকূলতাই এদের নিবৃত্ত করতে পারে না। এরা আপন শক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়ায়, আর আপন সাধনায় অর্জন করে নেয়—যশ, অর্থ, মান, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি।

সমাজ এদের নাম দেয়—'আত্মপ্রতিষ্ঠ'; নাম দেয়—'স্বয়ং-সিদ্ধ'। বহু শিল্পপতিরই, বহু কর্ম সাধকেরই কর্ম সাধনার গোড়ার ইতিহাসে থাকে এই রকম দুর্জয় পণ, দুরন্ত চেষ্টা, নিরলস নিষ্ঠা, আর পৃথিবীকে দেখার তৃষ্ণা।

এই আত্মলিপি গ্রন্থের রচয়িতা স্বর্গীয় বিজয়কুমার রায়ের জীবন প্রতিষ্ঠার গোড়ার ইতিহাসেও আছে এমনি লড়াই, এমনি পণ, এমনি নিষ্ঠা, এমনি তৃষ্ণা। বিজয়কুমারকে অনায়াসেই বলা যায় 'স্বয়ং-সিদ্ধ পুরুষ'!

বিজয়কুমার জন্ম গ্রহণ করেন পুব-বাংলার একটী নিতান্ত গণ্ডগ্রামে, অতি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে। আর শৈশবকাল হতেই নানা দুর্বিপাকের মধ্যে এবং ভাগ্যের নির্মমতার মধ্যে পড়ে কষ্ট পেয়েছেন প্রচুর। এই দিনলিপিটি থেকে জানা যায় কেমন করে তিনি সমস্ত প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করে বেরিয়ে পড়েছেন ঘর ছেড়ে। ছেড়েছেন অভ্যস্ত সমাজ, অভ্যস্ত পরিবেশ, অভ্যস্ত আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, যখন না ছিল যান-বাহনের এতো সুবিধা, না ছিল আজকের মতো ছাত্রদের জন্য নানা সুযোগ সুবিধার আয়োজন, তখন বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি একটি দুর্জয় পণ নিয়ে।

সে পণ? সে পণ হচ্ছে—

'মানুষ হবার পণ!

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পণ!'

শৈশব বাল্য কেটেছিল অনেক দুঃখ লাঞ্ছনা অপমান অবহেলার মধ্যে, তাই বুঝি এই পণ!

দারিদ্র্য যে চিত্তের সমস্ত বিকাশ পঙ্গু করে রাখে, এ সত্যটুকু তিনি বাল্যাবস্থাতেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সে-দিনের ইতিহাস লেখা হয়ে আছে এই দিনলিপিতে, দুঃখের কালিতে, অসহায়তার যন্ত্রণার পৃষ্ঠায়।

বিজয়কুমার এ লিপি লিখে রেখেছিলেন নেহাৎই আপন চিত্ত পরিতৃপ্তির জন্য। আত্মজীবনী প্রকাশ করে প্রচার করবেন এমন ইচ্ছা ছিল না। তাছাড়া বিজয়কুমার সাহিত্যিকও ছিলেন না যে, আত্মকথার নামে একখানি 'উপন্যাস' রচনা করে বসবেন। যা

লিখেছেন একেবারে সরল সহজ আটপৌরে ভাষায় এবং অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে।

সাহিত্যিক না হলেও, বিজয়কুমারের ভাষা অনেক জায়গায় সাহিত্যের স্পর্শে মনোগ্রাহী এবং প্রসাদ গুণে আকর্ষণীয়। এই জীবনী গ্রন্থটি পড়তে পড়তে আরো একটী জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে হচ্ছে জীবনীকার বা দিনলিপি লেখকের নির্মল সত্যবাদিতা।

শুনতে ভাল লাগবে বলে কোনো কিছু বানিয়ে বানিয়ে সুন্দর করে বলবার চেষ্টা তিনি করেননি, কিন্তু কেমন ভাবে তিনি সেই গণ্ডগ্রামের গণ্ডি ছেড়ে বৃহৎ বিশ্বের রাজপথে গিয়ে হাজির হয়েছেন, সে কাহিনী বানানো গল্পের থেকেও আকর্ষণীয়। কেমন করে একেবারে নিঃস্ব নিঃসম্বল হয়েও 'দেখতে গেলেন জগৎটাকে', তা নাটকের মতোই রোমাঞ্চময়।

আর শুধু দেখতেই গেলেন না, ফিরে এলেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে।

সার্থক নাম রাখা হয়েছিল 'বিজয়কুমার'।

বিজয়কুমার যে কেবলমাত্র ভাগ্যকে জয় করবার সংকল্প নিয়েই বিজয় অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিলেন তা নয়, তাঁর মধ্যে যে একটি সৌন্দর্যপিপাসু কবি মন ছিল, তা ধরা পড়ে সামান্য একটু বর্ণনার মধ্যে, সামান্য একটু অনুভবের ছোঁওয়ায়, সামান্য একটু কলমের টানে।

তিনি প্রায় বারো বছর বিদেশে কাটিয়ে 'জয়ী' হয়েই দেশে ফিরে এসেছিলেন।

ধরে নিতে পারা যায়, পূব-বাংলার সেই গ্রাম্য ছেলেটির চোখে ভেসে উঠেছিল বৃহৎ বিশ্বের ছবি, দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল আকাশের হাতছানি। ছেলেটির কাণে ভেসে এসেছিল দূর দিগন্তের বাঁশী।

বহু বিচিত্র দেশকে দেখেছেন বিজয়কুমার, দেখেছেন বিচিত্র সমাজ, বাঁচার লড়াইয়ের মধ্যে থেকেও তাদের অনুভূতির মধ্যে ধরে নিয়েছেন, লিখে রেখেছেন দিনলিপির মধ্যে।

এই দেখা এবং লেখার কাল আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে, যখন সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতা প্রায় একই ছাঁচে ঢালাই হতে শুরু করেনি। যখন দেশগুলি তাদের পুরানো সংস্কারের মধ্যে, পুরানো প্রথার মধ্যে আত্মমগ্ন, অতএব স্বকীয়তায় বিচিত্র। ভালো মন্দের প্রশ্ন তুলবো না, তবে এইটুকু বলতে দ্বিধা নেই—এই সহজ মানুষটির ঘরোয়া ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সেই পুরানো কালের একটা ঘরোয়া ইতিহাসের আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায়। এই দেখার মধ্যে 'তত্ত্ব' না থাক 'সত্য' আছে। এবং 'সত্য' সকল ক্ষেত্রেই মূল্যবান। সেই হিসেবে এই দিনলিপিটি প্রকাশের একটা মূল্য আছে।

বিজয়কুমার অবশ্য এই লেখাগুলিকে নিতান্তই অবহেলায় একধারে ফেলে রেখেছিলেন, দীর্ঘকাল পরে তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী শেফালিকা রায় এগুলি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে শুধু যে স্বামীর স্মৃতির প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করেছেন তা নয়, দেশের ছেলেদেরও প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন।

যারা সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত, যারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে ব্যর্থতার শিকার, যারা হতাশার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলছে, এবং যারা আপন অন্তরের অন্তর্নিহিত শক্তির খবরই জানে না, তাদের কাছে এই দিনলিপিটি 'প্রেরণার' কাজ করবে।

দৃষ্টান্তই তো এনে দেয় সাহস, শক্তি, উৎসাহ। গ্রন্থখানির প্রকাশ এবং প্রচার করবার উৎসাহের জন্য আর একবার ধন্যবাদ দিচ্ছি বিজয়কুমারের সহধর্মিণী শ্রীমতী শেফালিকা রায়কে।

১৭, কানুনগো পার্ক
গড়িয়া পোঃ
(চব্বিশ পরগণা)
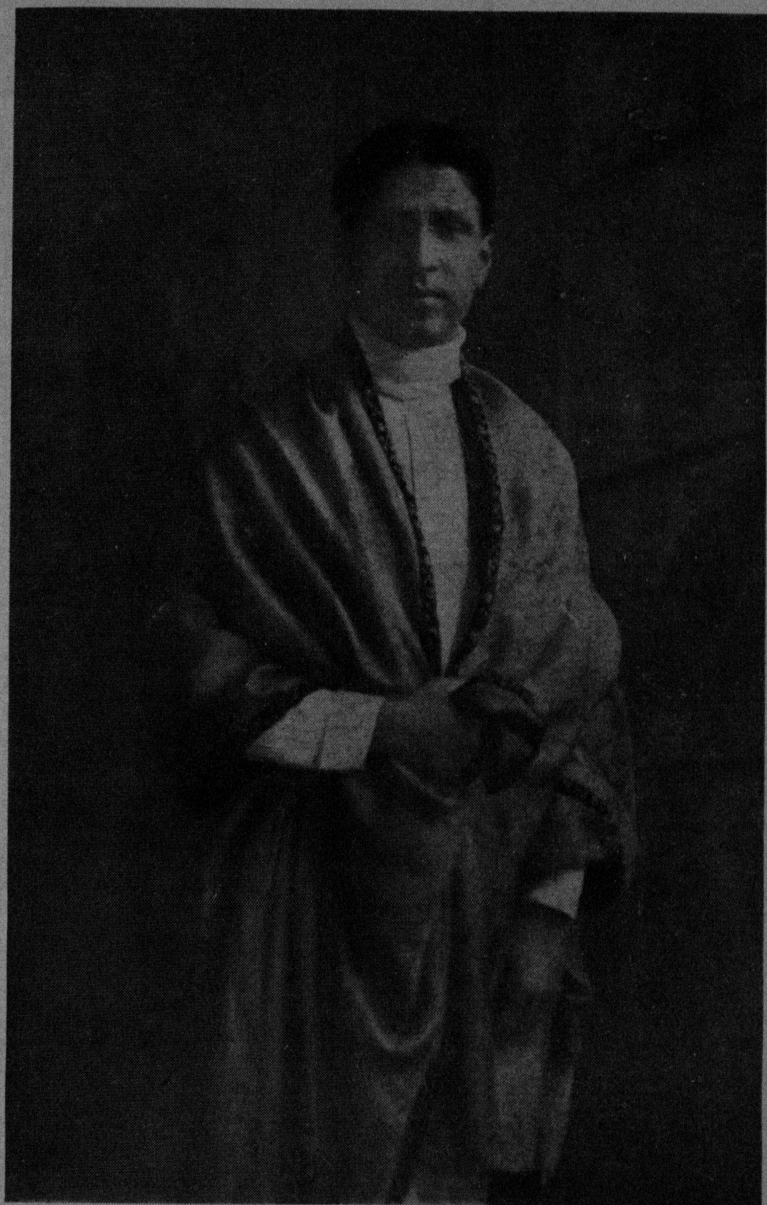
আমেরিকায় বক্তৃতাকালে 'ভারতীয় হিন্দু' বেশে লেখক
(১৯১৪ সাল)
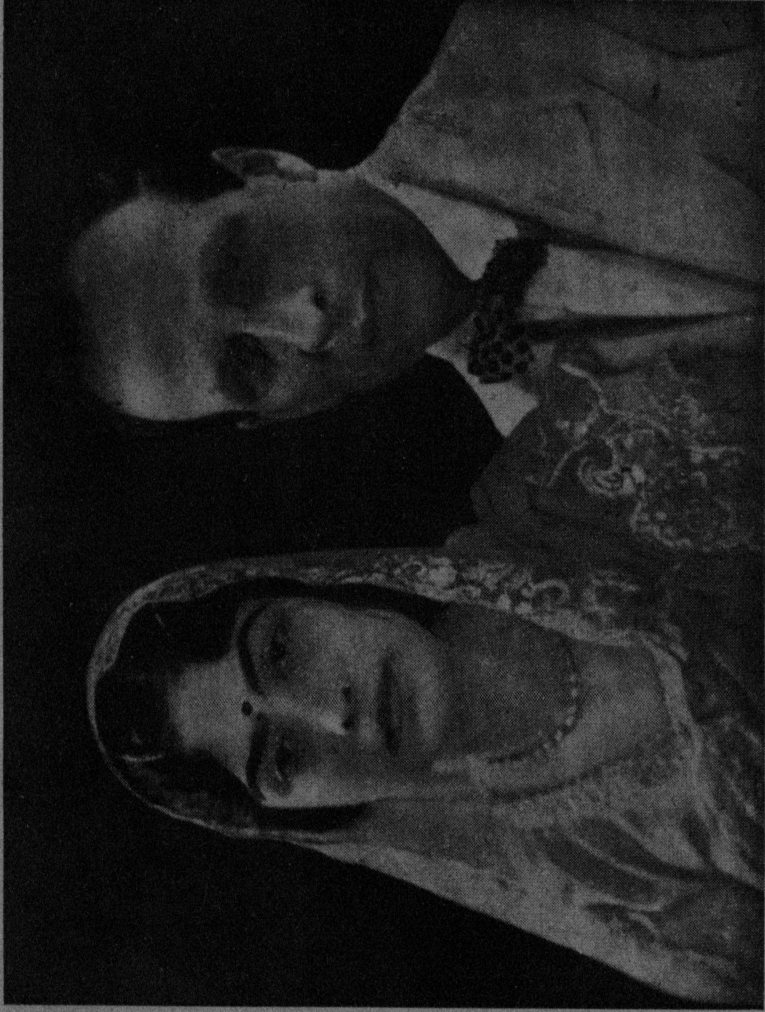
লেখক ও তাঁর জীবন-সঙ্গিনী

সাত সমুদ্র পারে

'জীবন থাকলেই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষাও থাকে।' এটা কি কোনও দার্শনিকের কল্পনা মাত্র? যিনি বলেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই একেবারে উন্মাদ ছিলেন না। এত বড় একটা কথার ভিতরে নিশ্চয়ই সত্য কিছু আছে। অবশ্য নিষ্কর্মা হয়ে বসে বসে শুধু আশা করলে, বোধহয় সে আশা স্বপ্নেই মিলিয়ে যায়। কিন্তু আশা ও আকাঙ্ক্ষার পেছনে যদি দৃঢ় সংকল্প ও সাধনা থাকে। তবেই তাকে রূপ দিয়ে বাস্তবে পরিণত করা যায়। ছুনিয়াতে অসম্ভব বলে বোধ হয় কিছুই থাকে না, যদি অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করা যায়।

কুলকাঠিতে শৈশব

আমার আদিবাড়ী বরিশাল জেলায়। ছোট্ট একটি অজ পাড়াগাঁ—কুলকাঠি গ্রামে। জাতিতে বৈদ্য। চারপুরুষ আগে কোন এক নবাবের অনুগ্রহে জমিদারী ও "রায়চৌধুরী" খেতাব পাওয়া গিয়েছিল।

সহরের স্কুলে পড়ার সময় হঠাৎ দাদার এক চিঠিতে জানলাম যে আমরা "সেনশর্মা" হ'য়ে গিয়েছি ও সব সময়ে যেন পৈতে ধারণ করি। জানিনা এর উদ্দেশ্য কি, আর দরকারও ছিল কিনা! তবে কিছুদিন পরে নূতন এক 'দাশশর্মার' কাছে শুনলাম—শর্মা হলে 'পুরো ব্রাহ্মণ' হয়ে যায়। এতদিন আমরা শুধু বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ছিলাম। তাছাড়া পরিবারের কারও মৃত্যু হলে ত্রিশ দিনের বদলে এগারো দিনেই শ্রাদ্ধ—শান্তি, নিরামিষ খাওয়া ইত্যাদি সব শেষ করা যায়।

যাক,—ছুর্দান্ত জমিদারের প্রতিপত্তি বা ভূসম্পত্তি কিছুই আমি দেখিনি। যা একটু অবশিষ্ট ছিল ছোট বেলায় বাবার মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনের দয়ায় ও মুস্‌লিম লীগের নেতাদের সহানুভূতিতে

সব তাদের হাতে তুলে দিয়ে আমার দাদারা ও পরিবারের আর সকলে গ্রামে কলকাতায় ও অন্য সব সহরে অতিকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন।

একদিন পাঠশালার পড়া শেষ হলো। গুরুমশাই মাইনে নিতে এসে বড় গলায় বলতে চেয়েছিলেন যে ছেলেটা না মরলে ভালই হবে। কিন্তু মা-দাদারা অসন্তুষ্ট হবেন সেই ভয়ে কথাটা সাম্‌লে নিয়ে বললেন —বেঁচে থাকলে ছেলেটি মানুষ হবে। মাথায় বিদ্যে বুদ্ধি দুইই আছে।

গ্রামে কোনও "হাই-স্কুল" ছিল না। সহরে যেয়ে কোনও বোর্ডিং-এ থেকে পড়বো সে সুবিধা বা সঙ্গতি কিছুই ছিল না।

আমার এক ভগ্নীপতি খুলনায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁকে দাদারা অনুরোধ করাতে এবং মাও দিদিকে চিঠিতে সব অভাব অনাটনের কথা খুলে লেখাতে তিনি অনেক বিবেচনা করে আমার ভার নিতে রাজী হলেন। ভারটা খুব বেশী না হলেও অসুবিধা অনেক ছিল। কারণ, আমার দিদি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের বৌ ছিলেন। প্রথম স্ত্রী অনেক ছেলে মেয়ে রেখে মারা যান। দিদিই তাদের অনেককে মানুষ করে-ছিলেন। তাঁর নিজেরও চার ছেলে দুই মেয়ে ছিল। ওপক্ষে-এপক্ষে মিলিয়ে ভগ্নীপতির পরিবারে ছেলে মেয়ে, ভাইরা, তাদের বৌ, নাতি-নাতিনী, আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিতে ভরা ছিল। যেমন, সেকালে বড় অফিসার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদের থাকত। ঐ সব আত্মীয়-স্বজনদের "চিমটি-কাটা" কথার জ্বালায় আমাকে অনেক সময় 'ছোট' ও লজ্জিত হয়ে থাকতে হতো। সব সময়েই "শালা-বাবুর" খোঁটা দিত। এমন কি গণক ঠাকুরও আমার ভাগনেদের ও আর সব আত্মীয়দের "কালা-পানি" পার করিয়ে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদির বড় বড় চাকরী দিয়ে বহু উচ্চে উঠিয়ে আমার ভগ্নীপতিকে খুশী করে "ডবল-ফি" নিতেন। শুধু আমার বেলায় কেরাণীর চেয়ে আর উঁচুতে ওঠাতেন না। ঐটুকু বয়সেই নিজের ভবিষ্যতে এত জজ, ম্যাজিষ্ট্রেটের মাঝে শুধু 'কেরাণী' হওয়ার দুঃখ ও লজ্জা মর্মে মর্মে বুঝতে পারতাম। গণকের ওপরও খুব রাগ হতো। আবার ভাবতাম—ও বেচারীর কি দোষ? ভগবান

আমার অদৃষ্টে যা লিখেছেন, গণক ঠাকুর আর কি করে সেটা খণ্ডাবেন? এখানেই এখুনি বলে রাখি—যখন সুদীর্ঘ দশ বছর পরে বিলেত হতে I. F. S চাকরী নিয়ে এই ভগ্নীপতির বাড়ীতেই আসি, তখন সকলের কি আনন্দ ও গর্ব। আমাকে নিয়ে কি যে করবে—মাথায় রাখবে না চেয়ারে বসাবে ঠিক পাচ্ছিল না। কি আদর, কত যত্ন, কতই যে খোসামদ! সকলেই প্রায় বললেন—আমরা তো ওর ছোটবেলা হতেই জানতাম ছেলেটি বংশ উজ্জ্বল করবে।

অবশ্য ভগ্নীপতি তখন বেঁচে ছিলেন না। বেঁচে থাকলে কি বলতেন জানি না। তখন পর্যন্ত তাঁর পরিবারে আমার চেয়ে ভাল চাকরী বা লেখাপড়া কেউ করেনি।

বরিশালে কৈশোর

তখনকার দিনে ম্যাট্রিককে এনট্রান্স বলা হতো। আমি খুলনা জেলায় ভগ্নীপতির বাসায় থেকে চার বছর হাইস্কুলে পড়েছিলাম। প্রত্যেক বছরেই ক্লাশে প্রথম হয়ে প্রাইজ পেতাম। তাছাড়া গুড-কণ্ডাক্ট, এ্যাটেনডেন্স, ড্রিল ইত্যাদির জন্যও আলাদা প্রাইজ পেয়েছি। কিন্তু ভগ্নীপতি সব সময়েই বলতেন—এই গ্রামের ভুতটা এসে আমার ছেলেদের নষ্ট করল।

চার বছর পরে এই সহরেই আমার ভগ্নীপতি রিটায়ার করে দু মাসের মধ্যেই সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে বরিশালে পোস্টেড হলেন। সকলেই মহাখুশী—রিটায়ার করে চাকরী নিয়ে নিজের দেশ বরিশাল জেলায় ফিরে যাচ্ছেন, তার ওপর ওদের আদি বাড়ীও ওই জেলার গৈলা গ্রামে। কাজেই আনন্দের ও উৎসাহের আর সীমা নেই। তবে নূতন জায়গায় থাকার কি বন্দোবস্ত আছে সেটা ভাল করে না জানায় ভগ্নীপতি শুধু প্রথমে একজন ঠাকুর চাকর ও আমাকে সঙ্গে নিলেন। সকলে ভেবে চিন্তে ব্যবস্থা করলেন—সব ঠিক-ঠাক হলে অতবড় একটা বিরাট পরিবার সেখানে

যাবে। বাড়ীর সকলেই আমাকে ভগ্নীপতির ওপর আমার কর্তব্যের বিষয়ে কঠোর উপদেশ ও আদেশ দিলেন। দিদি শুধু একটা খাবারের লিস্ট দিলেন, কারণ ভগ্নীপতির ডায়েবিটিস্ রোগ ছিল।

বরিশালে এলাম। ঠাকুর রান্না করত। চাকরটা যতদূর সাধ্য সব কাজেই ফাঁকি দিত। আমি ভগ্নীপতিকে যমের মত ভয় করতাম। একে তো হাকিম, তাতে আবার বেজায় কড়া মেজাজের বুড়ো মানুষ! কাজেই বকুনী খাওয়ার ভয়ে সব কাজ আমাকেই করতে হতো। তবে এতে আমার লজ্জা বা কষ্ট হতো না। আমি গ্রামের ছেলে, কোনও কাজে আপত্তি করলে মা বলতেন—'গৃহস্থ ঘরের ছেলেদের সব রকম কাজেই জানা ও করা উচিত। এ বিদ্যে স্কুলের বিদ্যে হতেও অনেক বেশী।' তিনি সব সময়েই আমাকে শেখাতেন—"পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।"

তবে যখন দেখতাম—সব ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে ও ফিরে আসছে, তখনই খুবই দুঃখ হতো। কারণ তখন পর্যন্ত আমি কোনও স্কুলে ভর্তি হইনি। ভগ্নীপতি এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্যই করেননি। এত বছর পরে অবাক হয়ে ভাবি, অতবড় পরিবারে কত লোক, কত আশ্রিত, আত্মীয়, স্বজন ছিল। কিন্তু বেছে বেছে আমাকেই নিয়ে এলেন স্কুল ছাড়িয়ে! একবারও ভাবলেন না আমার ভবিষ্যত বা লেখা পড়ার ক্ষতির বিষয়ে? কি নিষ্ঠুর ভদ্রলোক!

যদি বাড়ীর কর্তা আমার ভগ্নীপতি স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করতেন ও খেতেন, তবুও প্রায়ই ডাক্তার আসতেন। ওঁরা কি বলতেন বা ওষুধ দিতেন আমি কিছুই বুঝতাম না। ৪/৫ মাস এইভাবে কাটানোর পরে একদিন খুলনায় আমার দিদি ও ভাগনেদের কাছে টেলিগ্রাম গেল। দু'তিন দিনের মধ্যেই সকলেই চলে আসলেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম আমার ভগ্নীপতির অসুখ খুবই কঠিন। তিনিও আস্তে আস্তে বিছানায় শুলেন। অনেক চিকিৎসা করা সত্ত্বেও দু'মাসের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। বরিশালের এষ্টেটের বাড়ী ছেড়ে আমরা

সকলে ওদের পৈত্রিক বাড়ী গৈলাতে এলাম। গৈলা বরিশাল জেলার মধ্যে একটি খুব বড় শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। বৈদ্যের সংখ্যা খুব বেশী। তার মধ্যে দাশগুপ্ত, সেনগুপ্তের সংখ্যাই অধিক।

আমার দিদির সবচেয়ে বড় সৎ-ছেলে উকীল ছিলেন। তিনিই বাড়ীর কর্তা হলেন। এখন কি রকম বন্দোবস্ত হবে, কি ভাবে এত বড় সংসার চলবে, সেই নিয়ে প্রায়ই পরিবারের মধ্যে আলোচনা হতো। আমার নিজের চার ভাগনেই নাবালক ছিল। আমরা সকলেই প্রায় এক বয়সী ছিলাম—৪/৫ বছরের যা তফাৎ। আমি ও বড় ভাগনে সমবয়সী ছিলাম ও দুজনের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

ওই উকীল ছেলে বললেন—এখন যখন ভগ্নীপতি (তাঁর বাবা) নেই, তখন আর আমাকে রাখা সম্ভব হবে না। আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

দিদি তাতে রাজী হলেন না। বললেন—সব খরচই তো দাদারা দিচ্ছেন, শুধু খাওয়ার খরচটা বাদে। এত লোকের মাঝে একটি ছেলের খাওয়ার জন্য এমন কিছু খরচ হবে না—যেটা আমরা চালাতে পারব না। এখানে 'হাই-স্কুল' আছে। ওর গ্রামে নেই। সেখানে গেলে পড়াশোনা কিছুই হবে না। আমাদের বাবা ওর দুবছর বয়সেই মারা গেছেন। আমার এতগুলি ছেলেমেয়ের খাওয়া লেখাপড়ার মাঝে ওরটাও চলে যাবে। বিজয় এখানে থেকেই পড়বে। সম্পর্কে আমার ভাই কিন্তু বয়সে আমার চেয়ে এত ছোট যে ও আমার ছেলের মতই।

দিদির জোর গলার কথার ওপর আর কেউ কিছু বলতে সাহস করল না।

স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে হেড মাষ্টারমশায়কে সব বললেম কেন এতদিন পড়াশোনা বন্ধ ছিল। তিনি খুলনা স্কুল থেকেও আমার নম্বর আনালেন। আমি যে ফার্ষ্ট হয়ে প্রত্যেক ক্লাসে উঠেছি ও ইংরেজী ছাড়া প্রত্যেক বিষয়ে আশীর ওপরে নম্বর পেয়েছি, সেটাও তিনি জানলেন। অনেক বিবেচনা করে ঠিক করলেন প্রায় এক বছর

স্কুলে ভর্তি না হওয়ার জন্য আমার পড়াশোনার যা ক্ষতি হয়েছে সেটা যদি আমি ছ'মাসে পুরণ করে নিতে পারি, তবে তিনি আমাকে ডবল প্রমোশন দিয়ে যে ক্লাশে আমার পড়া উচিত সেই ক্লাশে ভর্তি করে নেবেন।

স্কুলে ভর্তি হলাম। পড়া আরম্ভ হলো। বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কারও কাছে কোনও সাহায্য পেলাম না। ভাগনেদের বাড়ীতে পড়াবার জন্য মাষ্টার আসতেন। কিন্তু তাঁকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার হুকুম ছিল না। দিদি সদ্যবিধবা, সৎ-ছেলেই বাড়ীর কর্তা। কাজেই দিদিও কিছু বলতে পারলেন না। একেই তো সৎ-ছেলের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে বাড়ীতে স্থান দেওয়া হয়েছে। বৎসরান্তে প্রমোশন পেলাম কিন্তু যতটা আশা করেছিলাম সে রকম কিছুই হল না।

আমাদের সহকারী প্রধান শিক্ষকমশাই খুবই স্বদেশী ছিলেন। তিনি তখনকার দিনের স্বদেশী খবরের কাগজ "হিতবাদী", "সঞ্জীবনী" সব পড়ে আমাদের শোনাতেন। তিনিই একদিন বললেন যে, কলকাতায় একটি 'সমিতি' (Association) আছে। সেই সমিতি হতে প্রতি বছর গ্র্যাজুয়েট ছেলেদের খরচ দিয়ে নানারকম উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়। এমন কি এনট্রান্স পাশ করা ছেলেদের "কুটির-শিল্প" যেমন, ছাতা, কালি, পেনসিল, দেয়াশালাই, বোতাম ইত্যাদি তৈরি শেখবার জন্য জাপানে পাঠিয়ে দেয়। তাঁর উপদেশে এই ফাণ্ডে আমরা কয়েকটী ছেলে প্রতি মাসে ক্লাশের মাইনের সঙ্গে বেশী টাকা এনে, কিছু কিছু চাঁদাও পাঠাতে আরম্ভ করলাম। এই সমিতি দেশের ও ছেলেদের উপকারের জন্য কত চেষ্টা করছে সেটাও তিনি অতি সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বলতেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই ক্লাশের পড়ার সঙ্গে তাঁর মুখে অতি আবেগের সঙ্গে 'মন প্রাণ দিয়ে দেশের ও দশের দুর্দশা ঘুচাব', 'আমরা বড় হব', 'বিদেশে যাব', 'দেশমাতার মুখ উজ্জ্বল করব', শুনে শুনে আমিও শয়নে-স্বপনে এই চিন্তাই করতাম। 'জাস্টিস' চন্দ্রমাধব

ঘোষের ছেলে শ্রীযুক্ত যোগেন ঘোষের উৎসাহে ও চেষ্টায় এই সমিতি গঠিত হয়েছিল।

শ্রীযুক্ত ঘোষ একবার এক সভায় বলেছিলেন—"আমাদের এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলার ঘরে ঘরে এই এ্যাসোসিয়েশনের বার্তা পৌঁছে দিয়ে আমরা জাতি-বর্ণ নির্বিচারে ছেলেদের উচ্চশিক্ষা ও কুটীর-শিল্প শেখাবার জন্য বিলেতে ও জাপানে পাঠিয়ে দেব, যেন তারা ফিরে এসে দেশের ও দেশবাসীদের উন্নতি করতে পারে। আমাদের গড়া এই এ্যাসোসিয়েশেন উপযুক্ত ছেলেদের যাতায়াতের খরচ ও ২।৩ বছরের জন্য মাসে মাসে কিছু হাত খরচও দেবে।

এখনকার তুলনায় সে সব যুগে আমাদের দেশে সাধারণ ঘরের ছেলেদের অতি সামান্য সুযোগই মিলত নিজেদের জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য ও একঘেয়েমী ঘুচাবার। শ্রীযুক্ত যোগেন ঘোষের বক্তৃতা শুনে বিদেশে যাওয়ার জন্য আমার আগ্রহ আরও বেশী হলো।

আমি একবার স্কুলে "আকাঙ্ক্ষা" বিষয়ে একটি রচনা লিখেছিলাম ও খুবই প্রশংসা পেয়েছিলাম। সেই "উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই" আমাকে দিন-রাত এক কল্পনার রাজ্য নিয়ে যেত, কি করে বিদেশে যাব, কি করে "বড়" হয়ে পরিবারের দুঃখ কষ্ট ঘোচাব, দিন-রাত কেবল তাই ভাবতাম। দেশে থাকলে চিরদিনের মত সেই দারিদ্র্য ও অভাবের মাঝে ডুবে থাকতে হবে, সেটা যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার পক্ষে তখনকার দিনে একটি কেরানীগিরিও জোটানো অতি অসম্ভব ছিল। দিন-রাত ভাবতাম অনেক দূরে, বহু দূরে চলে যাব, "বড়" হয়ে দেশে ফিরে সকলের দুঃখ ঘোচাব।

একবার ছুটিতে গ্রামের বাড়ীতে যেয়ে দাদাদের কাছে জাপান যাওয়ার কথাটা বললাম। আরও বললাম—এদেশে অতি কষ্টে M.A.-B.A. পাস করলেও বড় জোর পঞ্চাশ-ষাট টাকার একটা কাজ জুটবে। তাতে আমার বা আপনাদের কোনও দুঃখই ঘুচবে না। কিন্তু যদি

জাপানে যেয়ে ভাল একটা "শিল্প" শিখে আসতে পারি তাতে আমাদের সকলেরই আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হবে।

ওঁরা সকলেই খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন—এসব দুষ্টু বুদ্ধি তোকে কে দিল? এ যে "বামন হয়ে চাঁদে হাত"। বিদেশে যাওয়ার টাকাই বা কোথায় পাবি আর জাতটাও তো খোয়াবি—যদিই বা যেতে পারিস্।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে "কালাপানি" পার হলে জাত যেত। আমাদের দেশেরই এক প্রসিদ্ধ ভদ্রলোক অতি সামান্য কারণে জাতিচ্যুত হন,—"কালাপানি" না পার হয়েও! তিনি একদিন নৌকায় যাওয়ার সময় মুসলমান মাঝিদের রসুন পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করা মাংসের গন্ধের কথা গ্রামে ফিরে এসে গল্প করার ফলে তাঁকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল!

যাক্ আমি বললাম,—"কালাপানি" পার হয়ে তো ম্লেচ্ছদেশে যাচ্ছি না। এরা আমাদের মতই হিন্দু। আমাদের দেশের লোকরাই বহু যুগ আগে এই জাপানে বর্মায় 'রাবণের" দেশ—লঙ্কায়—বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম আমাদেরই হিন্দু ধর্মের এক শাখা। জাপানীরা সকলেই বুদ্ধদেবের শিষ্য। কাজেই জাপানে গেলে আমার জাত যাবে না। ঘরের ছেলে ঠিক ঘরেই ফিরে আসব।

আমার মা একথা শুনে অনেকটা শান্ত হলেন। কিন্তু আমার দুই দাদাই বললেন—হ্যাঁ, জাতের কথা তো ঠিক হলো, তবে বিদেশে যেয়ে লেখা পড়া শিখতে অনেক টাকার দরকার। সে টাকা কোথায় পাবি?

আমি তাঁদের সব সমস্যা স্বীকার করে উত্তর দিলাম,—আমি টাকার যোগাড় করতে চেষ্টা করছি। আপনাদের কিছুই দিতে হবে না। আমি যদি যাওয়ার খরচ যোগাড় করতে না পারি, তবে তো আর যাওয়াই হবে না। আর আপনাদেরও কোনও চিন্তা থাকবেনা।

এই কথা শুনে দাদারা সকলেই নিশ্চিন্ত হলেন। ভাবলেন

"দশমন তেলও পুড়বেনা, রাধাও নাচবে না।" আমার পক্ষে অত টাকার যোগাড় একেবারেই অসম্ভব। আর টাকা না পেলে আমি বিদেশে যেতেও পারব না!

সে যাক্, আমি এক সপ্তাহের ভেতরেই কলকাতা পৌঁছলাম। এই বিরাট সহরে আমার এই প্রথম পদার্পণ। এক মহিম চক্রবর্তী ছাড়া আর কাকেও জানতাম না। খুলনা স্কুলে পড়ার সময় এই মহিম চক্রবর্তী প্রথম শ্রেণীতে পড়তেন ও পদ্য লিখতেন। তিনিই স্কুলের একমাত্র "কবি" ছিলেন। আমরাও একবাক্য তাঁকেই "স্কুল-কবি" বলে স্বীকার করেছিলাম, তাঁর পদ্য শুনে আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম ও খুবই সমীহ করে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতাম। কিন্তু মহিমদা এই কাব্যের প্রবল স্রোতে ভেসে যান। 'পরীক্ষা-সাগর' আর পার হতে পারেননি। তিনি শেয়ালদা স্টেশনের কাছে হ্যারিসন রোডের ধারে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান খুলে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আমি তাঁর দোকানেই উঠলাম।

একটা সস্তা মেসের খবর দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞেস করাতে বললেন—অত ব্যস্ত কেন? দু-চার দিন এখানেই থেকে ধীরে সুস্থে মেস খুঁজে নিও।

বিছানা বাক্স দোকানে রেখে জিজ্ঞেস করলাম—স্নান করব কোথায়?

দেখিয়ে দিলেন রাস্তার জলের কল। স্নান সেরে দোকানেই চা বিস্কুট খেয়ে নিলাম। দুপুরে তাঁর সঙ্গে একটা সস্তার হোটেলে খেলাম। তারপর সারাদিন হ্যারিসন রোডের দুধারের ফুটপাত ধরে হেঁটে হেঁটে যতদূর সাধ্য ও সাহসে কুলাল 'কলকাতা সহর' দেখলাম। আবার সন্ধ্যাবেলা ওই হোটেলেই খেয়ে চায়ের দোকানের বেঞ্চে বিছানা বিছিয়ে শুলাম। মহিমদা টেবিলের ওপরে তার বিছানায় সারা রাত খুব জোরে জোরে নাক ডেকে ঘুমালেন। আমার বেঞ্চটী এত সরু ছিল যে, রাতে ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে যেয়ে ধুপ করে মেজেতে পড়েও গেলাম।

যাক্, দু-এক দিনের ভেতরেই শঙ্কর ঘোষের লেনে এক সস্তার মেসে উঠে গেলাম।

পরের দিনই Association এর সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বিশেষ কিছু আশা ভরসা দিলেন না। বললেন—অনেক applications এসেছে। তবে যদি কোনও পদস্থ ব্যক্তির সুপারিশ নিয়ে যোগেনবাবুকে দরখাস্তের সঙ্গে পাঠাতে পার, তবে হয়তো তিনি জাপান যাওয়ার একটা ভাড়া মঞ্জুর করতে পারেন। দু'মাসের মধ্যেই খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হবে কোথায় কোন তারিখে কার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

আমাদের এক আত্মীয়ার সঙ্গে তেওতার জমিদার শ্রীযুক্ত পার্বতী শঙ্কর রায়ের বিয়ে হয়েছিলো। আমি প্রথমে তাঁর কাছেই গেলাম ও সুপারিশ চিঠি নিলাম। তারপর অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তি, যেমন সঞ্জীবনী কাগজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ইণ্ডিয়ান মিরারের শ্রীযুক্ত নরেন সেন প্রভৃতির চিঠি নিয়ে যোগেনবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন যে এই সব চিঠির জোরে খুব সম্ভব জাপান যাওয়ার খরচ পেতে পারি।

মহা উৎসাহে মেসে ফিরে এলাম। আমি যে জাপান যাওয়ার চেষ্টা করছি তা কাকেও জানাইনি। নিজেই যতদূর সাধ্য চুপি চুপি সব যোগাড় করছিলাম। আমি কলেজ স্ট্রীটের Y. M. C. A. তে ভর্তি হলাম, যদি একটু ইংরেজীতে কথা বলতে ও বুঝতে পারি। সেখানের সেক্রেটারী Dr. Barbar আমাকে বেশ একটু স্নেহের চোখেই দেখতেন ও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলা, লেখা ও পড়া শেখাতে লাগলেন। সব সময়েই আমার খোঁজ নিতেন। তার একটা কারণও ছিল। আমি প্রত্যেক রবিবারে তাঁর বক্তৃতা শুনতে যেতাম ও বাইবেল ক্লাসেও উপস্থিত থাকতাম। স্কুলে পড়ার সময় একদিন হেডমাষ্টারমশায় বলেছিলেন যে "বাইবেলের" ভাষা অতি সোজা ও চমৎকার। "বাইবেল" পড়ে ও শুনে মনে হতো যে সব

ধর্মের মধ্যেই একটা মিল আছে। তফাৎ খুব বেশী নেই, উদ্দেশ্য একই, দেশ কাল রীতি অনুসারে মানুষকে "ভাল"-এর ও ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই সব ধর্মের নানাভাবে চেষ্টা।

ওয়াই. এম. সি. এ.

Y. M. C. A-এর সেক্রেটারী Dr. Barbar একদিন আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে আমার নাম কি, বাড়ী কোথায়, কি ধর্ম, কলকাতায় কি করছি—সব জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে আমি তাঁকে সব খুলে বললাম। জাপান যাওয়ার জন্য দরখাস্ত দিয়েছি তাও জানালাম।

আমার সব কথা শুনে বললেন,—আমার যখন টাকার অভাব তখন জাপানে না যেয়ে আমেরিকাতেই যাওয়া উচিত। কারণ সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রোজগার করে নিজেদের পড়ার খরচ চালানোর সুবিধা ও সুযোগ আছে। বহু ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরা উপার্জন করে সেখানে থাকার ও পড়ার খরচ চালাচ্ছে। তারা কিভাবে কত রকম কাজ করে টাকা রোজগার করে সে বিষয়ে তিনি আমাকে অতি সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর কথায় আমেরিকার উচ্চশিক্ষার পদ্ধতি ও অর্থ উপার্জনের উপায় জেনে জাপানে না যেয়ে আমেরিকায় যাওয়ার ইচ্ছেটাই আমার এত বেশী প্রবল হলো যে দিনরাত কেবল ওই চিন্তাই করতাম। আমেরিকায় যেতে পারলে টাকার ভাবনা ভাবতে হবেনা, কারও কাছে হাত পাততে হবে না—সেই আনন্দে ও আশায় আমার মনের বল খুবই বেড়ে গেল। সব সময়েই গুন গুন করে গাইতাম,—'তা বলে ভাবনা করা চলবে না।'

আমি আবার সাহস করে যোগেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে জাপান না যেয়ে আমেরিকায় যাওয়ার ইচ্ছে জানালাম। তিনি বললেন,—আমেরিকায় যাওয়ার খরচ কখনই পাবে না। কারণ ঐ দেশে যাওয়ার খরচ অত্যন্ত বেশী ও "আগাম টাকা" (Advance-deposit)

আমেরিকান ডলার না দেখাতে পারলে জাহাজ থেকে নামতেই দেবে না।

তখন আর কি করি, মনে মনে ভাবলাম একবার যদি জাপানে পৌঁছতে পারি তবে আমেরিকায় যাওয়ার টাকাও কোনও ভাবে যোগাড় করতে পারব। ওই তো একই রাস্তা—জাপানেই প্রথমে যাওয়া যাক্।

প্রায় এক মাস পরেই খবরের কাগজে বের হলো যে সব ছেলেদের জাপান যাওয়ার passage মঞ্জুর হয়েছে তাদের নাম সোমবার দিন Association-এর অফিসে ঘোষণা করা হবে।

ভয়ে ও ভাবনায় কিভাবে যে আমার সময় কাটল সেটা লিখে প্রকাশ করা অসম্ভব।

সোমবার দিন Association-এর অফিসে যেয়ে দেখি বাপরে সে কি ভীড়! ছেলেরা তো সকলেই এসেছে, আবার তাদের সঙ্গে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনও এসেছে। কতই যে জল্পনা কল্পনা চলছে। আমিই একমাত্র পাড়া গেঁয়ে "বাঙ্গাল" ছেলে। আমার বুকের মাঝে যেন হাতুড়ী পেটার শব্দ হচ্ছিল। মনে হলো সকলেই যেন সেই "ঠক্ ঠক্" আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

বেলা দুটোর সময় যোগেনবাবু এলেন ও একটা কাগজ খুলে ছেলেদের নামগুলি পড়তে লাগলেন। যখন তিনি পড়লেন—"Roy—Passage to Japan, Cottage Industry", তখন আমার নামই যে B. K. Roy, আমাকেই জাপান যাওয়ার খরচ দেওয়া হয়েছে—সেটা যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কোথায় ছোট্ট কুলকাঠি গ্রামের ছেলে ভগ্নীপতির আশ্রয়ে যা একটু লেখা পড়া শিখেছি আর কোথায় সুদূর জাপান! এটা যেন ঠিক স্বপ্ন দেখার মত মনে হচ্ছিল।

যাক্, কোনও মতে সেক্রেটারীর কাছ হতে কাগজ পত্রগুলি নিয়ে মেসে এসে শুধু রুম-মেটকেই এই সুখবরটা দিলাম। তাকেও বারণ করে দিলাম আর কাকেও যেন না বলে। কারণ গরীবের ছেলে আমি

Association-এর টাকায় জাপানে যাওয়ার চেষ্টা করছি এটা যেন কারও সহ্য হচ্ছিল না। কত যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনতাম। একজন বলত বিজয় রায় সাঁতরে জাপানে যাবে ক্ষুর নিয়ে। নাপিতের কাজ শিখে এসে আমাদের বিনে পয়সায় কামিয়ে দেবে।

কাজেই আমি যে জাপান যাওয়ার passage পেয়েছি কুটির-শিল্প শেখার জন্য, সেটা প্রকাশ করার একটুও ইচ্ছে ছিল না। ঠিকই জানতাম যে Association-এর টাকায় আমি জাপানে যাচ্ছি জানাজানি হলেই মেসের লোকেরা খুসী হওয়া তো দূরের কথা, হিংসের জ্বালায় আরও বেশী ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে। কিন্তু পরের দিন সকালে উঠেই শুনি যে সব ছেলেরাই জেনেছে আমার জাপান যাওয়ার কথা। উৎসাহ দেওয়ার চেয়ে হতাশার ও খারাপ কথাই বেশীর ভাগ ছেলেরা বলতে লাগল। তাতে আমার রাগ ও দুঃখ যথেষ্ট হলেও জেদও খুব বেড়ে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম জাপান হয়ে আমাকে আমেরিকায় যেতেই হবে। সেখানে আমি লেখাপড়া শিখে 'বড়' হব, 'মানুষ' হব। এদের দেখাব—বিজয় রায় নাপিত বা বাঁদর হয়নি।

Association-এ যেয়ে খবর পেলাম যে আমাকে চল্লিশ দিনের মধ্যেই রওনা হতে হবে। দাদাদের কাপড়-চোপড় কেনার জন্য টাকা পাঠাতে লিখলাম। টাকা পেয়ে 'চাঁদনী চকে' যেয়ে সাহেবী পোষাকের অর্ডার দিয়ে ও আর সব জিনিষ কিনে গ্রামে গেলাম। বাড়ীতে এসে মা ও দাদাদের কথা শুনে মনে হলো তাঁরা সকলেই খুব খুসী হয়েছেন ও গর্ব অনুভব করছেন। এই ছোট্ট গাঁয়ের ছেলে আমিই প্রথম নিজের চেষ্টায় সুদূর বিদেশে—জাপানে যাচ্ছি। সেই যুগে আমাদের গ্রামের বহু লোক ট্রেনই দেখেনি, বিদেশে যাওয়া তো "আকাশ-কুসুম।" বরিশাল নদীর দেশ,—জলে জলেই নৌকো ষ্টীমারে যাতায়াত হতো। আবার শরৎ বাবুর লেখা বই 'পল্লী-সমাজে'-এর মতই আমাদের গাঁয়ের লোকদেরও হিংসা দ্বেষ ও গাত্রদাহ যথেষ্ট ছিল। আমিই প্রথম বিদেশে যাচ্ছি, বড় হব, অনেক টাকা রোজগার করব—এটা যেন কেউ সহ্য

করতে পারছিল না। সে যে কি অস্বোয়াস্তি তা সহজেই বুঝতে পাচ্ছিলাম। আমাকে ও আমার পরিবারের সকলকে অভিনন্দন জানাতে হচ্ছে, খুসী হওয়া প্রমাণ করার জন্য দাঁত বের করে হাসতে হচ্ছে, অথচ ভেতরে ভেতরে অনেকেই জ্বলছিল।

মা ও দাদাদের আনন্দ ও গর্ব যত হয় তেমনি ভাবনাও হয় খুবই। ওই বিদেশে মাসে মাসে খরচের টাকা কোথায় পাব, অসুখ হলে কে দেখবে—এই রকম নানা চিন্তা। আমি যদি সত্যি কথা বলি যে খরচের টাকা যোগাড় না করেই শুধু passage-এর টাকার জোরেই জাপান রওনা হচ্ছি ও সেখানে কাজ করে, টাকা জমিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দিব, তবে আমাকে কখনই জাপানে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না। কাজেই "অশ্বত্থমা হত ইতিগজ"—গোছের একটা গোঁজামিল দিয়ে সকলকে বুঝিয়ে বললাম,—আমার সব টাকার যোগাড় হয়েছে। যে টাকা দাদারা কাপড়-চোপড় ইত্যাদি কেনার জন্য দিয়েছেন তাছাড়া একটি পয়সাও বেশী দিতে হবে না।

পঞ্জিকা দেখে ভাল দিনে মাকে বৌঠানদের ও আর সব পূজনীয়দের প্রণাম করে কল্‌কাতা রওনা হলাম। তুই দাদাও আমার সঙ্গে কলকাতায় আসলেন। মার কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম—"ভাল হিন্দু হয়ে থাকব, ম্লেচ্ছের খাওয়া কখনও খাব না, ওই দেশের লোকের সঙ্গে —অর্থাৎ মেয়েদের সাথে মেলামেশা করব না ইত্যাদি।

মা ও পরিবারের সকলেই নদীর ঘাটে এসে আমাকে নৌকায় উঠিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেলেন। আমি নৌকার ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় তাদের দিকে, গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। জানি না কত বছর পরে আবার আমার সোনার বাংলাদেশে ফিরে আসব, বুড়োমার সাথে আর দেখা হবে কিনা এই সব কেবল মনে হচ্ছিল। পরে শুনেছিলাম, আমার মা সব সময়েই কাঁদতেন ও গাইতেন—"আমার রামশশী গেছে বনে, আর কি দেখব তাকে এ জীবনে।"

মা আমার অতি সুন্দরী ছিলেন, খুবই ফর্সা ও লম্বা, যাকে বলে—'মেমদের মত'। অতি মিষ্টি গলায় তখনকার দিনের পল্লীগীতি গাইতে পারতেন। গ্রামের বিয়েতে, উৎসবে সব সময়েই মার ডাক পড়ত গান গাইবার জন্য। মা বরিশালের মেয়ে ছিলেন না। কুলীন স্থান—সেনহাটী ছিল তাঁর বাপের বাড়ীর দেশ। সেই যুগের তুলনায় বেশ লেখাপড়াও জানতেন। কথা বলার ও শাড়ী পরার ঢং ঠিক বরিশালের মেয়েদের মত ছিল না। অনেক বছর পরে যখন আমেবিকা, বিলেত ঘুরে, চাকরী নিয়ে, তাঁদের মত অনুসারে বিয়ে করে নুতন বৌ নিয়ে গ্রামে গেলাম, তখনও তিনি বধূ-বরণের সময় অমনি বাঁশীর মত মিষ্টি গলায় গান গেয়েছিলেন॥

কলকাতায় দাদাদের ইচ্ছে অনুসারে, এক পণ্ডিতকে ডাকান হলো। শুনলাম তিনি খুব ভাল পঞ্জিকা দেখতে পারেন। তিনি টিকি নেড়ে পঞ্জিকা দেখে অনেক শ্লোক আওড়ে বল্‌লেন—আমার জাপান রওনা হওয়ার দিনটি অতি খারাপ। "শনির দশা", "মঘা অশ্লেষা" ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে। ওই দিনে কখনও রওনা হওয়া উচিত নয়। যদি রওনা হই, তবে আর কখনও দেশে ফিরে আসব না।

দাদারা ও মেসের সকলেই বললেন—ওই রকম খারাপ দিনে রওনা হওয়া অসম্ভব।

আমি চুপচাপ বসে সব শুনছিলাম। পণ্ডিতমশায় চলে গেলে বললাম,—জাহাজ ওই দিনেই ছাড়বে, পঞ্জিকার "শুভ দিনের" জন্য অপেক্ষা করবে না। সকলেই রওনা হয়ে চলে যাবে, আমিই শুধু যেতে পারব না। Passage-এর টাকা জমা হয়ে গেছে, আমি ছাড়া আরও চোদ্দ জন বাঙ্গালী হিন্দু ছেলে ওই জাহাজেই যাচ্ছে—Association-এর দেওয়া passage নিয়ে। তাছাড়া আরও কত জাহাজ ওই দিনেই হাজার হাজার হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শি ও আরও অনেক জাতের যাত্রী নিয়ে রওনা হবে। কারও কিচ্ছু হবে না—শুধু আমার বাঙ্গালী হিন্দুরাই ফিরব না? ভগবান কি শুধু বেছে

বেছে আমাদেরই শাস্তি দেবেন "মঘা অশ্লেষাতে" রওনা হওয়ার জন্য? আমি তো ওই দিনেই রওনা হব বলে গ্রামের বাড়ী হতে "শুভ দিন" দেখেই রওনা হয়েছি? মাঝপথে—কলকাতায় আবার "ভাল-দিন" দেখার কি দরকার?

আমার তখন রাগে দুঃখে সারা শরীর জ্বলছিল। এরা যেন আমার বিদেশ যাওয়া বন্ধ করার জন্যই যত সব ছুতো খুঁজছিলেন! কত চেষ্টা কত কষ্টের পরে আমার "স্বপ্ন" সফল হতে চলল—তা নয়—যত সব বাজে অজুহাত! যাক্, আমার যুক্তি শুনে দাদারা ও আর সকলেই যেন নরম হ'লেন। তবুও গ্রাম্য কুসংস্কারের জন্য তখনও দাদারা 'তবুও' 'কিন্তু' বলে মুখ ভার করে বসে রইলেন। শেষ পর্যন্ত রফা হ'ল—কালীঘাটে মা কালীর পূজো দিয়ে, সেই নির্মাল্য মাথায় নিয়ে জাহাজে উঠব। দাদারা আমাকে নিয়ে গিয়ে কালীঘাটে বেশী টাকার পূজো দিয়ে পাণ্ডাদের কৃপায় ওই অশুভ দিনের দোষ খণ্ডন করালেন!

বিদেশ যাত্রা

রওনা হওয়ার দিন সকাল হতেই মুষলধারে এমন বৃষ্টি শুরু হলো যেন সারা পৃথিবীটাই কাঁদতে আরম্ভ করল। দাদাদের তো এমনই মন খারাপ। আবার এত বৃষ্টির মাঝে আমাকে জাহাজে উঠিয়ে অতল সমুদ্রে ছেড়ে দিতে আরও বেশী বিষণ্ণ হলেন। দাদারা আমার চেয়ে অনেক বড়। আমার বয়স যখন মাত্র দু' বছর তখন বাবা মারা যান। দাদারা আমাকে ভাইয়ের মত না দেখে ছেলের মতই মানুষ করেছিলেন। বারে বারেই বলতে লাগলেন,—তুই সত্যিই এই দুর্যোগে রওনা হবি?

যাহোক, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেয়ে নিয়ে "চাঁদনী-চকের" সাহেবী পোষাক পরে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে জিনিষ-পত্র চাপিয়ে দাদাদের সঙ্গে রওনা হলাম। খিদিরপুরে জাহাজ ঘাটে এসে অত

লোকজন, অত জাহাজ, যাত্রীদের আসা-যাওয়ার চঞ্চলতা দেখে আমি যেন ঘাবড়ে গেলাম। তবে বিদেশে যাওয়ার উৎসাহে ও অহঙ্কারে ভয়টাকে অনেক দূরে ঠেলে দিলাম।

জাহাজে ওঠার সময় হলো। দাদাদের প্রণাম করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম পিঁপড়ের সারির মত। দাদাদের ও আমার চোখের জলে জামা ভিজে গিয়েছিল। এত কান্না যে আমি কাঁদব সেটা আগে বুঝতেই পারিনি। চোখের জলে সবই ঝাপসা দেখছিলাম। অন্ধের মত সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে উপরে উঠে এক পাশে দাঁড়িয়ে দাদাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে জাহাজ হতে সিঁড়ি উঠিয়ে নিল। প্রকাণ্ড একটা "ভোঁ" আওয়াজ হলো। বুকের মাঝে যেন বিরাট একটা ধাক্কা দিল। জাহাজটি আস্তে আস্তে তীর হতে সরে যেতে লাগল। দাদারাও ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার তখন মনের যা অবস্থা সেটা কোনও দিন কাকেও বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না। একবার মনে হলো বেশী দূরে তো যাইনি, লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে দাদাদের সঙ্গে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। কি দরকার আমার এই অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে ছুটে যাওয়ার ?

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ খেয়াল হলো জাহাজ আর চল্‌ছে না—থেমে গেছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম—যতক্ষণ জোয়ার না আসে, জাহাজটি এখানেই থাক্‌বে। খুব বিরক্ত হলাম জাহাজওয়ালাদের ওপর। কেন বাপু—খিদিরপুরের "ডকে" অপেক্ষা করলেই তো হতো ? আরও কিছুক্ষণ দাদাদের দেখতে পেতাম। অনেকক্ষণ পরে জোয়ার এলে জাহাজ আবার চল্‌তে আরম্ভ করল।

প্রায় সন্ধ্যার সময়ে সমুদ্রে এসে পড়লাম। কিন্তু সমূদ্রের চেহারা দেখে হতাশ হলাম। এত দিন ধারণা ছিল সমুদ্রের জল গভীর নীল—প্রায় কালো রং-এর মত। এখন দেখি ঠিক বর্ষাকালের নদীর জলের মত ঘোলা। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে কত চিন্তাই যে করতে লাগলাম।

খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল। আমার টেবিলে আরও তিনজন বাঙ্গালী ছাত্র ও ডুজন সিন্ধি ব্যবসায়ী বসলেন। ওই ব্যবসায়ীরা আরও তিন-চার বার জাপানে গিয়েছেন। জীবনে প্রথম কাঁটা-চামচ দিয়ে খাচ্ছি। কি মুস্কিল! সাম্‌নে এত খাবার থাকা সত্ত্বেও পেট ভরবে কিনা সন্দেহ! যাহোক, ঐ সিন্ধি ভদ্রলোক ডুজনেই আমাদের সব বিষয়ের পরামর্শদাতা হলেন ও খুব যত্ন করে, কায়দা-কানুন বাৎলে দিলেন। খাওয়া হলে আরও কয়েকজন বাঙ্গালীর সাথে পরিচয় হলো। খাওয়া শেষ হলে কেবিনে যেয়ে কাপড় জামা খুলে শুয়ে পড়্‌লাম। কারণ প্যাণ্ট, কোট, জুতো, মোজা আর যেন সহ্য করতে পাচ্ছিলাম না। সেই কোন সকালে "সাহেব" সেজেছিলাম। গায়ে ও পায়ে যেন ফোস্‌কা পড়ে গিয়েছিল।

ভোরে উঠে বাইরে সমুদ্রের দিকে তাকাতেই চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। সত্যি সত্যিই "নীল জলের অসীম সাগর"। এক রাতের মধ্যেই ঘোলা জল কোথায় মিলিয়ে গেছে। চারিদিকে কেবল নীল রং-এ ভরা। এত ভাল লাগল, মনে হলো ডি. এল. রায়ের গানটি—"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।" রবি ঠাকুরের "সমুদ্রের প্রতি" কবিতাটিও আওড়ালাম—"হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।" চারিদিকে শুধু নীল জলের ঢেউ—অসীম, অনন্ত। "কুয়োর ব্যাং-এর সাগরে এসে পড়া"— আমার অবস্থাও তাই! জীবনে এই প্রথম সমুদ্র দেখে আনন্দে যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম। আত্মীয়-স্বজন, বাড়ী-ঘর, দেশ ছাড়ার দুঃখ ও বেদনা যেন অনেকটা লাঘব হলো। আমার এ আনন্দ ও উৎসাহের কথা কাকে বলব? ইচ্ছে হচ্ছিল—চীৎকার করে মা ও দাদাদের বলি—দেখে যাও কি সুন্দর দৃশ্য! ভাবনা নেই, ভয় নেই, আমি যাচ্ছি ভেসে—অনন্ত সাগরে। আমার জন্য চিন্তা ক'রো না।

তখনি কেবিনে বসে মা ও দাদাদের অতি লম্বা চিঠি লিখলাম

সব বর্ণনা দিয়ে। প্রিয়জনকে আমার আনন্দের অংশ দিয়ে মনটা বেশ হালকা করলাম।

"চাঁদ সওদাগর" ও "ইষ্ট ইণ্ডিয়ার" জাহাজের কথা শুধু বইতেই পড়েছিলাম। এ যুগের তুলনায় আমার "প্রথম জাহাজ" কত ছোট ও সাধারণ। তখন কিন্তু মনে হয়েছিল বাপরে, কত বড়, বিরাট জাহাজ, কত লোকজন! আমার এত দিনের অভিজ্ঞতা ছিল খুলনা হতে বরিশাল যাওয়ার ষ্টীমার ও গ্রামের নৌকাগুলি। পরে অবশ্য আমেরিকায় আশি হাজার টনের জাহাজেও আসা-যাওয়া করেছি। সে যেন একটা বিরাট সহর। সে সব বর্ণনা এখন নিষ্প্রয়োজন।

রেঙ্গুন

আমাদের জাহাজটি পাঁচ দিন পরে রেঙ্গুন-এর কাছে এসে থামল। সমুদ্র হতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে ইরাবতী নদীর তীরে বর্মার রাজধানী রেঙ্গুন সহর।

আমাদের সঙ্গে একটি আসামী ছেলে ছিল। তার নাম বড়ুয়া। রেঙ্গুনে এক পরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোককে লেখা চিঠি তার কাছে ছিল। তিনি জেটীতে উপস্থিত ছিলেন। খাওয়ার জন্য আমাদের চারজনকেই নেমন্তন্ন করলেন। আমরা প্রস্তুত হয়ে তার সঙ্গেই নেমে গেলাম। যাওয়ার পথে তিনি আমাদের 'বেঙ্গলী সোশ্যাল ক্লাব' দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর বাড়ীতে অতি আদর যত্নের সঙ্গে বাঙ্গালী খাওয়া খেয়ে বড়ই তৃপ্তি পেলাম। রাত দশটায় জাহাজে ফিরে এলাম।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার পরে রেঙ্গুন সহর দেখতে বের হলাম। ট্রামে উঠে ঐ সহরের প্যাগোডা দেখতে গেলাম। পাহাড়ের ওপরে অতি সুন্দর প্রকাণ্ড প্যাগোডা—বর্মিদের ধর্মমন্দির। এটি নাকি ৫৪৫ খৃঃ পূঃ সালে তৈরী হয়েছিল। এখানে বুদ্ধদেবের চুল, খাওয়ার বাসন, পরণের কাপড় রক্ষিত আছে। প্যাগোডাতে একটী মুক্তা দেখলাম। সেই যুগে ঐ মুক্তাটির দাম নাকি ৩৫০০০

টাকা ছিল। এই মন্দিরে অনেক ঘণ্টা আছে। বৌদ্ধরা পূজোর সময় ফুল, প্রদীপ, ঘণ্টা ইত্যাদি ব্যবহার করে। একটা প্রকাণ্ড ভারী ঘণ্টা দেখলাম। প্রবাদ আছে যে এই ঘণ্টা নড়াতে পারবে, সে যেখানেই থাকুক না কেন মৃত্যুর সময় এখানে আসবেই। দেখলাম—অনেকেই চেষ্টা করছে। চার-পাঁচ জন ইংরেজও চেষ্টা করে ঘণ্টা নড়াতে পারল না। তাদের দুর্গতি দেখে আমাদের আর ঘণ্টার কাছেও যেতে সাহস হলো না। সকলেই সকলের মুখের দিকে চেয়ে "ঘণ্টা নাড়িবে কে" জিজ্ঞেস করলাম! এইখানে একটা অন্ধের অপূর্ব বাজনা শুনলাম। তার হাতে একটা সেতারের মত যন্ত্র, এক পায়ে করতাল বাঁধা, অন্য পায়ে দুটা বাঁশের কাঠি। এই তিনটাই একসঙ্গে বাজিয়ে কি যে মিষ্টি সুরের সৃষ্টি করল। এত ভাল লাগল শুনতে!

তথাগত বুদ্ধদেবের "ভিক্ষুরা" (শিষ্যরা) জন সাধারণের দানেই জীবন-যাপন করেন। আগামী কাল কি খাবেন, কি হবে—সে ভাবনা করেন না। নিজেদের আত্মার মুক্তির জন্যই তাঁদের সর্বদা চিন্তা ও সাধনা। প্রত্যেক দিনই এক একটা পশুর পূজোর দিন। সোমবারে বাঘের, মঙ্গলবার সিংহের, বুধবারে হাতীর, বৃহস্পতিবারে ইন্দুরের, শুক্রবারে শূওরের শনিবারে "ড্র্যাগনের" ও রবিবারে —অৰ্দ্ধেক পশু ও অর্দ্ধেক পাখীর পূজো হয়। সব মূর্তিগুলিই লাল ও হলদে রংএর মোমের তৈরী। এই প্যাগোডা দেখার পর পার্শি বাজার দেখলাম। এটা অনেকটা আমাদের নিউ মার্কেটের মত। তবে অনেক ছোট। "ভিক্টোরিয়া পার্ক" অর্থাৎ "জু" দেখে বিকেলের দিকে জাহাজে ফিরলাম। "জু"তে সাদা হাতী দেখতে গিয়ে নিরাশ হলাম। কারণ সাদা নয়, একটু যেন হালকা ছাই রংএর মত। আমাদের দেশে ঘটকরা যেমন কণে দেখানোর সময় কালো মেয়েকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করে এ যেন অনেকটা সেই রকম!

পরের দিন রয়েল লেক দেখতে গেলাম। পাহাড়ের ওপরে বাগান

দিয়ে ঘেরা এই লেকটি অতি সুন্দর। আরও চমৎকার—সূর্যাস্তের দৃশ্য। রেঙ্গুন সহরটি খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলি খুব চওড়া ও সোজা। বর্মি মেয়েরা অনেক রং বেরং-এর নিজেদের হাতে তাঁতে বোনা সিল্কের লুঙ্গী পরে। গায়ে শুধু জামা থাকে—হাত ঢাকা। মাথায় উঁচু চুড়ার মত খোপায় নানা রং-এর ফুল গোঁজা থাকে। বর্মি মেয়েরা চুলের ও দেহ-ত্বকের খুবই যত্ন করে। প্রায় সব মেয়েদেরই মাথায় খুব লম্বা ও সোজা চুল। মুখে পাউডার না মেখে "তানাখা" নামে একরকম চালের গুঁড়ো মাখে। সব সময়েই মেয়েরাও লম্বা লম্বা চুরুট মুখে দিয়ে ফুঁকতে থাকে। তারা নিজেরাই চুরুট তৈরী করে। বর্মিজ চুরুট খুবই প্রসিদ্ধ। বেটা ছেলেরা অনেকেই শরীরে ফল ফুল হাতী ঘোড়া ইত্যাদির "উলকী" আঁকায়। বর্মি পুরুষরা বড়ই আলসে ও সৌখীন। ঘরে খাবার, পরণে লুঙ্গী, মুখে চুরুট ও জুয়াখেলার জন্য কিছু পয়সা থাকলেই মহা খুসী। ভবিষ্যতের চিন্তা মেয়ে পুরুষরা কেউ করে না। সকলেই খুব হাসি-খুসী ও স্ফূর্তিবাজ। বেটাছেলেরা অধিকাংশ সময়েই বাড়ীতে বসে কাটায়। আর মেয়েরা বাইরের সব কাজ-কর্ম, দোকান-পসার, বেচা-কেনা, জমি-জমা, ব্যবসা দেখা শোনা করে। কাজেই চাষ আবাদ ও ভারী কাজের জন্য বহু চীনা ও ভারতীয়দের আনানো হয়। এরা শুধু যে আলসে বর্মি ছেলেদের আরও আলসেমীর ও জুয়াখেলার সুযোগ দিয়েছে তা নয়, পরিশ্রমে অধ্যবসায় ও উৎসাহ নিজেদেরও আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট করে নিয়েছে। বহু ভারতবাসী ও চীনারা সামান্য কুলীর কাজে এদেশে এসে লক্ষপতি হয়েছে। প্রায় বেশীর ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানী, ওকালতী-জজিয়তি, বড় বড় চাকুরী, ব্যাঙ্ক খনি জঙ্গল—সব বিদেশীদের হাতে চলে গিয়েছিল। বহু বর্মির মান্দ্রাজী ব্যাঙ্কে ধার ছিল। এই কারণে বিদেশী বিশেষতঃ ভারতীয়দের ওপর এদের ভীষণ রাগ ও আক্রোশ। অথচ নিজেদের আলসেমী ও জুয়াখেলার জন্যই যে এদের আর্থিক ও মানসিক অবনতি সেটা কিছুতেই বুঝতে চেষ্টা করত না।

পরের দিন জাহাজ বদল করতে হলো। এই জাহাজটি আরও ছোট। আমাদের বেশ একটু দুঃখও হলো আগের জাহাজটি ছাড়তে। সমুদ্রও যেন চটে গেলেন। ঢেউ ও ঝড়ের দাপাদাপিতে আমার এত ভীষণ সমুদ্র-পীড়া হলো যে মাথা তোলার ক্ষমতা ছিল না। যেমন বমি, তেমনি মাথা-ঘোরা। একেবারে শয্যাশায়ী। ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে হলো। তিনি বললেন,—ভয়ের কিছু নেই। সমুদ্র ঠাণ্ডা হলেই আমিও ঠাণ্ডা হব। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে কয়েকটি গোলাপী রংএর বড়ি খেতে দিলেন। ক্যাবিনে—বদ্ধ ঘরে না থেকে ওপরে ডেকের খোলা হাওয়ায় থাকতে বললেন।

পেনাং

তিনদিন পরে "পেনাং"-এর কাছে এলাম। দুধারে পাহাড়ের সারি, তার মাঝে নীল জলের ওপর দিয়ে রাজহাঁসের মত ভেসে আস্তে আস্তে জাহাজ এসে বন্দরে পৌঁছাল। এখানে আমাদের দেশের টাকা চলে না। এরা ডলার ব্যবহার করে। এক ডলার আমাদের দেশের দেড় টাকা ও এদের দেশের—"একশো সেণ্ট" হয়। জাহাজ আসার সঙ্গে সঙ্গে বহু দোকানদার এসে ছবির পোষ্টকার্ড, 'সুভ্যেনির', অনেক রকম সৌখীন জিনিষ, কাপড়-জামা কিনতে ও টাকা বদল করে নেওয়ার জন্য ডাকাডাকি করতে লাগল। আমরাও কিছু টাকা বদলে ডলার নিলাম।

পেনাং সহরটী ছোট। এই বন্দরটি নাকি খেদার নবাব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেয় ও এর নাম রাখা হয় "প্রিন্স অফ্ ওয়েলস"। এখানে বহু চীনা ও মান্দ্রাজী বাস করে এবং বড় বড় ব্যবসা সবই প্রায় এদের হাতে। পাহাড়ের ওপরে এক "চাইনীজ প্যাগোডা" আছে। এছাড়া আর কিছুই দেখার নেই। পাহাড়টিকে দূর হতে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন নীল মেঘের মত আকাশের গায়ে লেগে আছে। যতই এগিয়ে যাচ্ছিলাম পাহাড়টিও রং বদলে বদলে নীল হতে সবুজ, সবুজ হতে

ধূসর পাহাড়ে পরিণত হলো। আঁকা-বাঁকা পাথুরে পথে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠতে আমার ভারী উৎসাহ ও আনন্দ হচ্ছিল। প্যাগোডাতে পৌঁছানর একটু আগে একটা পুকুরে প্রায় তিনশো কচ্ছপ দেখলাম। ঘণ্টা দুই পরে পাহাড় থেকে নেমে এলাম।

জাহাজে "পেনাং" এর একটি অতি উপাদেয় ফল খেতে দিল। নাম হচ্ছে—"ডুরেণ্ড" ফল। মুখ হতে তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে মুখ ধুয়ে বাঁচলাম। ছোট্ট কাঁঠালের মত ফলটি, কিন্তু কি বিচ্ছিরী গন্ধ! মনে হচ্ছিল অন্ন-প্রাশনের ভাত উঠে আসছে। কিন্তু আর সকলেই বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছিল, শুধু আমরা ক'জন বাঙ্গালী ছাড়া। এই ফল খেতে সবচেয়ে ভাল লেগেছিল চীনাদের। মনে মনে ভাবলাম বেটারা নিজেদের দেশে আরশুলা, কুকুর, বিড়াল খায়, এত তাদের কাছে "অমৃত"!

সন্ধ্যাবেলা জাহাজ সিঙ্গাপুরের দিকে রওনা হলো।

সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুর বন্দরটি খুবই বড় ও সুন্দর। জাহাজে নানা রকমের সুন্দর সুন্দর জিনিষ নিয়ে ফেরিওয়ালারা এল। ওই সব জিনিষের মাঝে রং-বেরং-এর প্রবাল দেখে যেমন আশ্চর্য হলাম তেমনি আনন্দও হলো। কি চমৎকার দেখতে! না কিনতে পারলেও চোখে দেখেই যেন মন খুসীতে ভরে উঠল। এখানে গরম ও শীত কিছুই বেশী নয়। যেন "চির-বসন্তের" দেশ। তবে মাঝে মাঝে সামান্য একটু গুমট মনে হয়। এই বন্দরকে সামরিক দিক থেকে সুরক্ষিত করার জন্য অনেক কিছুই ইংরেজরা করেছে ও করছে।

এখানে "বোটানিক্যাল গার্ডেনটি" খুবই সুন্দর। সিঙ্গাপুরে নানাদেশের নানারকম লোক বাস করে। খুব সস্তায় সব জিনিষ পাওয়া যায়। কারণ আফিং মদ ও তামাক ছাড়া আর সব জিনিষই "বিনা-শুল্কে" আমদানী হয়। এখানে এক রকম ফল খেলাম—"মাং-

'গোষ্টিন"। অনেকটা আমাদের দেশের গাবের মত, তবে ভেতরের শাঁস অতি সুস্বাদু। লিচুর চেয়েও ভাল খেতে। বিকেলের দিকে "হংকং" রওনা হলাম।

হংকং

হংকং বন্দরটি খুব বড় ও সুন্দর। সমুদ্রের জল এখানে খুবই গভীর। সেইজন্যই দুনিয়ার যত বড় জাহাজই হোক না কেন এই বন্দরে আসতে কোনও মুস্কিল নেই। আগে এটা চীনাদের অধীনে ছিল। এখন ইংরেজদের হাতে। চীনের সঙ্গে "আফিং-যুদ্ধের" পরে খেসারত স্বরূপ এটা ইংরেজরা নিয়ে নেয়। এখানের আবহাওয়া খুবই ভাল। আমরা এখানে থাকতেই খুবই ঝড় বৃষ্টি হলো। শুনলাম একে বলে—"টাইফুন"।

হংকং-এ অনেক শিখ্ আছে ও এদের একটি "গুরুদোয়ারও" আছে। এরা সকলেই ভারতীয়দের সাথে অতি ভাল ব্যবহার করে ও আমাদের সকলকে দু'দিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াল। এখানে অবশ্য চীনাদের সংখ্যাই খুব বেশী। সব ধনী চীনা ও আর সব বড় লোকদের বিরাট বিরাট অতি সুন্দর বাড়ী, "ভিক্টোরিয়া পার্ক" পাহাড়ের ওপরে আছে। নীচে সমতল জায়গায় ব্যবসায়ী ও আর সব লোকের বাস। এই পাহাড়ে উঠতে 'কেবল-ট্রাম' আছে। এঞ্জিন ঘরটী দুশো ফুট উঁচু পাহাড়ের ওপরে। একটা ট্রাম উঠে যাচ্ছে ও আর একটা নেমে আসছে। সবই আমার এই প্রথম দেখা। দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। চীনারা তাদের মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের অনেক বেশী আদর যত্ন করে। মেয়ে জন্মালে বাপ-মার মুখ শুকিয়ে যায়। আর ছেলে হলে আনন্দের ও অহঙ্কারের সীমা থাকে না। চীনা মেয়েরা শিশুকাল হতেই নানাভাবে শক্ত করে পা বেঁধে ছোট করে। যার পা যত ছোট, সেই তত বেশী সুন্দরী। বড় লোকের মেয়েদের ওই ছোট্ট ছোট্ট পায়ের ওপরে শরীরের ভারে চলা-ফেরা করা বেশ কষ্ট-

দায়ক মনে হয়। যেন হেলে-দুলে চলে। অনেক সময়েই তারা দাসীর কাঁধে ভর দিয়ে যাতায়াত করে বাড়ীর মধ্যেও। বাইরে তো এক পাও হাঁটে না,—সব সময়েই যান-বাহনে চলাচল করে। তাদের পায়ে সর্বদাই মোজা পরা থাকে। কাজেই "চরণের গড়ন" ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু যাদের পায়ে মোজা থাকে না, তাদের ওই রকম ছোট ছোট ফোলা ফোলা বিকৃত পা দেখে আমাদের এত খারাপ লাগতো মনে হতো যেন "কুষ্ঠ ব্যাধি" হয়েছে। হংকং Free-port হওয়াতে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচুরভাবে চলে। সমস্ত দক্ষিণ 'চায়না', ফরাসী ইন্দো-চায়না, (এখন অবশ্য সব বদ্‌লে গেছে) শ্যাম ইত্যাদি দেশের ব্যবসা কেন্দ্র হচ্ছে হংকং। ইংরেজ "বেনে জাত", ঠিক জায়গাটি বেছে নিয়ে চেপে বসেছে! এই বন্দরটিকে চিরকালের জন্য নিজেদের দখলে রাখার জন্য বহু সৈন্য-সামন্ত যুদ্ধের সরঞ্জাম রেখেছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করেছে।

সাংঘাই

এখান থেকে 'সাংঘাই' চললাম। 'চীন-সমুদ্রে' ঝড়ে খুবই কষ্ট হয়েছিল। জাহাজটি এত দুলছিল যে আমি বিছানা হতে নীচে পড়ে যাই। ভয়ের চোটে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য কেবিনের দরজা খুলে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করতে যেয়ে দেখি যে প্রত্যেক দরজায় একজন করে নাবিক শক্ত করে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বললে—কোনও যাত্রী কেবিনের বাইরে যেতে পারবে না। ভয়ঙ্কর ঝড় বইছে, ডেকের ওপর দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উঁচু ঢেউ যাচ্ছে।

হতাশ হয়ে ভাবলাম হায় ভগবান, বরিশালের জলের দেশের মানুষ আমি, শেষে কি এত ভাল সাঁতার জানা সত্ত্বেও এই কেবিনের ভেতরে ডুবে মরতে হবে? মরার আগে হাত পা ছুঁড়ে একটু সাঁতারও কি দিতে পারব না? সে রাত্রে কোনও যাত্রীই ঘুমাতে পারেনি। মহা অশান্তিতে রাত কাটল। ভোরের দিকে ঝড়ের দাপাদাপি একেবারে কমে গেল।

বাইরে বেরিয়ে দেখি ডেকের একপাশে খোঁয়াড়ের মত করে অনেক গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগী ও হাঁস রাখা হয়েছিল, সেগুলির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তখনকার দিনে "রেফ্রিজারেটার" "ঠাণ্ডাঘর" ইত্যাদি কিছুই ছিলনা। কাজেই খাবারের জন্য জ্যান্ত পশু পাখী জাহাজে নিয়ে যাওয়া হতো। একজন নাবিককে জিজ্ঞেস করাতে বলল,—সব গরু, ভেড়া, মুরগী, হাঁস ইত্যাদি খোঁয়াড় শুদ্ধ সমুদ্রের পেটে গেছে! সে সারারাত নিজেকেও দরজার ও রেলিং-এর সাথে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। নইলে তার দশাও ঐ ভেড়াদের মতই হতো।

আমাদের জাহাজটি মাত্র কয়েক ঘণ্টা সাংহাইতে ছিল। এইটি চীন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র। অনেক বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী প্রভৃতিদের বড় বড় দোকান ও ব্যবসা আছে।

নাগাসাকি

যে দেশকে আমরা একদিন "অসভ্য জাপান" বলে মনে করতাম এবং যে দেশের অধিবাসী আজ পৃথিবীর মাঝে এক শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতি হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে,—সেই জাপানে এসে পৌঁছলাম। নাগাসাকি বন্দরটি অতি সুন্দর। প্রায় দু মাইল লম্বা হবে। আস্তে আস্তে আমাদের জাহাজ এসে জেটিতে নোঙ্গর করল। জেটির কিছু দূরেই জাহাজ তৈরীর বিরাট "ডক" ও কারখানা। এই বন্দরে "সি-গ্যাল" পাখী দেখতে পেলাম না। 'হক' জাতীয় অনেক পাখী দেখলাম। ছ' সাত ঘণ্টা মাত্র থেকে জাহাজ আবার "কোবে"র দিকে রওনা হোলো।

কোবে

এইটি খুব বড় ব্যবসার বন্দর। আমরা এখানে প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ছিলাম। এখানে একটি নদীও আছে। কিন্তু এক ফোঁটা জলও ছিল না নদীতে। পাহাড়ের ওপর "চাঁদের-মন্দির" ও তার পাশেই

সুন্দর একটি জল-প্রপাত। অপর দিকে নীল সমুদ্র। এই দুটীর মিলনে বড় সুন্দর এক দৃশ্য হয়েছে, ঠিক যেন তুলি দিয়ে আঁকা কবির কল্পনার একটি ছবি। কোবের কয়েক মাইল দূরে ওসাকা সহর। এই সহরটিকে প্রমোদ-উদ্যান বলে। ওসাকাতে অনেক খাল থাকায় এদেশী লোকেরা একে জাপানের ভেনিস বলে। এখান থেকে রওনা হয়ে প্রায় দুদিন পরে "ইয়োকাহামা" বন্দরে পৌঁছালাম।

ইয়োকাহামা

এখানে সমুদ্র খুব গভীর না থাকায় জাহাজগুলি বন্দরের জেটিতে আসতে পারে না। আমাদের জাহাজও সমুদ্রের মাঝখানে নোঙ্গর করল। সব জাপানী যাত্রীরাই যেন কি উৎসুক হয়ে দেখছিল। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি ?

বহুদূরে বরফে ঢাকা চুড়ো দেখিয়ে বলল—ঐ দেখ ফুজিয়ামা !

এই বিখ্যাত "ফুজিয়ামা" পাহাড়ের ছবি জাপানীরা অনেকভাবে আঁকে ও ছাপায়। বন্দরের একটা দিক অর্দ্ধ-চক্রের মত পাহাড় দিয়ে ঘেরা। আমরা নৌকা করে জেটিতে নামলাম। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই রেল ষ্টেশনে পৌঁছে ট্রেণে উঠে ত্রিশ মাইল দূরে টোকিও সহরে পৌঁছালাম।

টোকিও

এই সহর জাপানের রাজধানী। খুব বড় ও বিস্তীর্ণ সহর। সমুদ্রের সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক নেই। তবে "সুমিডা নদী" টোকিওর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়াতে বহু ব্যবসা-বাণিজ্যের জিনিষ-পত্র এই নদী পথে আমদানী-রপ্তানী হয়। আগেই বলেছি জাপানে আসা আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। আমেরিকা যাওয়ার খরচ পাইনি। শুধু জাপানে আসার প্যাসেজ আমি পেয়েছিলাম। এখানে থেকে কাজকর্ম করে যদি কিছু টাকার যোগাড় করে আমেরিকায়

যেতে পারি সেইটাই ছিল আমার ইচ্ছা। টোকিওতে অনেক ভারতীয় ছাত্র ছিল। তারা সকলে একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে এক সঙ্গে থাকত। এই বাড়ীর নাম ছিল "ইণ্ডিয়া হাউস"। আমিও সেখানে উঠলাম। এখানে উনিশজন ভারতীয়ের মাঝে পনেরজনই বাঙ্গালী ছিল। আমাদের সকলকেই খুব আদর যত্ন করল। শুনলাম এখানে মাথা পিছু ৪০।৫০ ইয়েন (জাপানী টাকা) অর্থাৎ ৫০।৬০ টাকাতেই এক মাস বেশ কেটে যায়। এই অল্প টাকায় এত ভাল খাওয়া ও থাকা খুবই সস্তা ও ভাল বন্দোবস্ত বলে মনে হলো। চার-পাঁচ দিন স্নান করিনি, কোথায় স্নান করব জিজ্ঞেস করাতে একটী ছেলে উত্তর দিল—খুব দরকার না হলে আমরা বাড়ীতে স্নান করি না। কারণ এতে খরচ খুব বেশী লেগে যায়। সকলেই আমরা "সাধারণ স্নানাগারে" স্নান করি। আমি আজ স্নান করতে যাব, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

সন্ধ্যা ছ'টায় ঐ ছেলেটীর সাথে রওনা হলাম স্নান করতে। মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা প্রকাণ্ড সার্কাসের ধরণের জায়গায় এসে পোঁছলাম। শুনলাম এইটাই "সাধারণ স্নানাগার"। ওই ছেলেটির পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলাম। প্রকাণ্ড একটী "হল"। দরজার পাশে এক জাপানী বসেছিল। তার কাছ হতে দুটি টিকিট কিনলাম। দেয়ালের গায়ে অনেক "লকার" ও চাবি ঝুলছিল, সেখানে একটি "লকার" খুলে আমার ও বন্ধুটির কাপড়-চোপড় খুলে রাখ্‌তে বলল। 'হল'-এর ভেতরে বহু লোক একেবারে নেংটো অবস্থায় হাঁটা-চলা করছিল। ওই দৃশ্য দেখে আমি ভাব্‌লাম ব্যাপার কি? এটা কি একটা 'পাগলা গারদ'?

আমার বাঙ্গালী বন্ধুটি চট্‌পট্ সব কাপড়-জামা খুলে ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—ও কি হচ্ছে? সং-এর মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? সব খুলে ফেল! এক টুকরা কাপড়ও পরণে থাকলে জলে নামতে দেবে না।

তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সব খুলে ফেলে শুধু তোয়ালেটি কোমরে

জড়িয়ে তাড়াতাড়ি পর্দাটা সরিয়ে যে দৃশ্য দেখ্‌লাম তাতে আমার মাথার মধ্যে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। প্রকাণ্ড একটা সুইমিং-পুলের মাঝখানে শুধু একটা দড়ি বাঁধা—এক পাশে ছেলেরা ও অন্য পাশে মেয়েরা স্নান করছে, সাঁতার কাটছে। সকলেই একেবারে নেংটো—এক গাছা সুতো পর্যন্ত কারও গায়ে নেই। কেউ হাত-পা ঘসছে, আবার কেউ সটান নেংটো হয়ে জলের ধারে শুয়ে আছে। মেয়েঝিরা পয়সা নিয়ে সকলের, এমন কি বেটাছেলেদেরও, সমস্ত শরীর মালিশ করে দিচ্ছে!

আমার বন্ধু জলে নেমে স্নান করছিল। আমাকে ডেকে বলল—দেরী করছ কেন? তোয়ালটি খুলে ফেলে জলে নেমে পড়।

সকলেই আমার তোয়াল জড়ানো 'মূর্তি' দেখে হাসছিল ও কি যেন বলাবলি করছিল। চোখ যেন আমার ঝাপ্‌সা হয়ে আসছিল। এক দৌড়ে বাইরে এসে 'লকার' খুলে কাপড়-জামা পরে বাঁচলাম! মনে মনে ভাবলাম যে সারাজীবন স্নান না করি তাও ভাল, কিন্তু ঐ ভাবে সকলের সামনে নেংটো হয়ে কোনও দিনও স্নান করতে পারব না।

স্নানের ঘরে মেয়ে পুরুষের উলঙ্গ অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে সত্যিই এরা একটা অসভ্য জাত!

'ইণ্ডিয়া-হাউসে' কয়েকদিন থাকার পরে একটি জাপানী পরিবারে থাকার বন্দোবস্ত করে নিলাম। কারণ অত সামান্য টাকা দিয়ে মাস চালানোও আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। জানি যে দেশ থেকে একটি টাকাও আসবে না, আর আমিই বা কোন মুখে দাদাদের লিখব টাকা পাঠাতে? আসবার সময় তাঁদের বলে এসেছিলাম—আমার টাকার যোগাড় সব হয়ে গেছে, আপনাদের একটি পয়সাও দিতে হবে না! কবে কোথায় চাকরী পাব ঠিক নেই। কাজেই সঙ্গে যা টাকা এনেছিলাম, সেই টাকাতেই খুব হিসেব করে চালাতে হবে যতদিন চাকরী না পাই। আবার জাপানী ভাষা না শিখতে পারলে

চাকরী পাওয়াও সহজ হবে না। জাপানে সেই যুগে খুব অল্প লোকই ইংরেজী বলতে ও বুঝতে পারত। 'ইণ্ডিয়া-হাউসে' থাকতে সব সময়েই বাংলা বা ইংরেজীতেই কথা বলতাম।

আমি যে জাপানী পরিবারে থাকার বন্দোবস্ত করলাম সেই বাড়ীর কর্তা জাহাজে চাকরী নিয়ে কয়েকবার কলিকাতায় গিয়েছিল, দু' একটি হিন্দি কথাও জানত। কাজেই আমারও তাড়াতাড়ি জাপানী ভাষা শেখার সুবিধা হয়ে গেল। জাপানীরা অত্যন্ত সৌন্দর্য প্রিয় ও কারুশিল্পী। ছোট-বড় গরীব-দুঃখী প্রত্যেকেই খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বাড়ী-ঘরও খুব ছিম্-ছাম্। আসবাবপত্রের কোনও বালাই নেই। মেঝেতেই সকলে বিছানা বিছিয়ে শোয়। আমার ঘরটিও খুব পরিষ্কার ও গুছানো ছিল। তবে খাওয়া একেবারেই ভাল না! পরের দিন "ইণ্ডিয়া-হাউসে" যেয়ে খারাপ খাওয়ার কথা বলাতে দুজন বাঙ্গালী ছেলে এসে বাড়ীওয়ালাকে জাপানী ভাষায় কি যেন বলল। পরের দিন থেকে আর আমাকে সুঁট্‌কী-মাছ বা পচা মূলার তরকারী দিতনা, যেটা নাকি জাপানীদের অতি প্রিয় খাদ্য। ভালই খাবার পেলাম এবং আমিও বেঁচে গেলাম।

একদিন স্নান করার কথা বলাতে বাড়ীওয়ালা বলল—আচ্ছা, তুমি যদি পাবলিক বাথ-এ স্নান করতে না চাও তবে আমি বাড়ীতেই সব বন্দোবস্ত করে দেব। কিন্তু তার জন্য বেশী পয়সা দিতে হবে। আমাদের মধ্যে কথা হতো "মুক-অভিনয়ে" অর্থাৎ হাত পা নেড়ে। এরা এ বিষয়ে খুবই পটু ও খুব সহজেই বুঝে নিয়ে সব ঠিক করে দিত। সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলল,—সন্ধ্যার সময় গরম জল দেবে। ঠিক ছ'টার সময়ে আমাকে ডেকে বাড়ীর পেছনে এক ফালি বাগান ছিল সেখানে নিয়ে গেল। একটা কাঠের "টব" দেখিয়ে বলল—ঐ তোমার স্নানের গরম জল।

টবের নীচের দিকটা এক রকম ধাতুতে তৈরী ছিল। ওপরের দিকটা সবই কাঠের। বাগানের ভেতর থেকে রাস্তার কিছুই দেখা

যায় না। এক রকম ছোট ছোট গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। আমি তোয়ালে জড়িয়ে পেছনের দরজা দিয়ে এসে জলে হাত দিয়ে দেখলাম জলটা বেশ গরম। এদিক ওদিক তাকিয়ে তোয়ালেটা খুলে ফেলে জলে নেমে বসলাম। অনেক দিন পরে স্নান করতে পেয়ে বাঙ্গালী ছেলের—বিশেষতঃ বরিশালের—কি যে আনন্দ হলো বুঝতেই পারা যায়। আরামে বসে বেশ করে হাত পা রগড়ে রগড়ে স্নান করতে লাগলাম। ছ-তিন মিনিটের মধ্যেই বাড়ীর ছুজন মেয়ে শাক মূলো মাছ ইত্যাদি এনে আমার স্নানের "টবে"র কয়েক হাত দূরে একটী জলের কলের কাছে বসে ধুতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে গল্পও জুড়ে দিলেন। এদিকে টবের এর জলটা ক্রমেই যেন বেশী গরম হতে লাগল। আমি ভেবে-ছিলাম টবে গরমজল ঢেলে দিয়ে গেছে। স্নান করতে করতে ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু জল এত বেশী গরম হয়ে উঠল যে আমার সারা শরীরে যেন ফোস্কা পড়ে যাচ্ছিল। যতবারই উঠে যেতে চেষ্টা করছিলাম, তত বারই মনে হচ্ছিল মেয়ে ছুটী বুঝি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের কাজের চেয়ে গল্প করার দিকেই বেশী মন ছিল। এত গরম জলে বসে থাকতে অসহ্য যন্ত্রণায় কি যে করেছিলাম আজ ঠিক মনে নেই। বোধহয় পায়ের চাপে টবের কাঠের ছু তিন টুকরো ভেঙ্গে বেরিয়ে যায়, জল ছিটকে বাইরে ভেসে যায়। আমিও লাফিয়ে এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেলাম। মেয়ে ছুটী হি-হি করে হাসতে লাগল। আমার তো লজ্জায় মনে হচ্ছিল—"পৃথিবী তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।" আমি যে নেংটো ছিলাম মেয়ে ছুটির সে দিকে কোনও খেয়াল বা নজরই ছিল না। কেন আমি পাগলের মত দৌড়ালাম এতেই তাদের যত হাসি।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর কর্তা এসে হাত মুখ নেড়ে কি সব বলল। আমাকে বাগানে নিয়ে যেয়ে দেখাল যে টবের নীচে উনোনের মত গর্ত ও ভেতরে কয়লার আগুন জ্বলছে। কেন জল বেশী গরম হওয়ার আগেই উঠে যাইনি, কেন টব ভাঙ্গলাম ইত্যাদি অনেক কিছুই বললে।

আমি আর কি উত্তর দেব ? একে তো ভাষা জানি না, তার ওপরে টব ভেঙ্গেছি,—দোষ তো আমারি। মেয়েদের সামনে নেংটো হওয়ায় যে কোনও লজ্জা আছে জাপানীদের কাছে সেটা বলাই বৃথা। কাজেই চুপ করেই থাকলাম। স্নানের বিলের সাথে টব ভাঙ্গার বিলও পাঠিয়ে দিল।

বাড়ীওয়ালার সাথে কথা বলে জানলাম যে টোকিওতে কাজ পাওয়া কঠিন। কিন্তু ইয়োকাহামাতে কাজ পাওয়া সহজ। তার এক খুড়ো সেখানে জাহাজ ঘাটে কাজ করে। আমি যদি সেখানে যাই তবে ওই খুড়োর বাড়ীতেই থাকতে পারব এবং সে কাজও যোগাড় করে দিতে পারবে। আগেই বলেছি আমার জাপানে আসার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কাজ করে টাকা জমিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দেওয়া। আমি সেইজন্যই "ইয়োকাহামতে" যাওয়া ঠিক করলাম। আমি কোন্ তারিখে সেখানে পৌঁছাব জানিয়ে খুড়োকে চিঠি দেওয়া হলো। সেই চিঠির উত্তরে খুড়ো জানালেন যে সব ঠিক করে রাখবেন ও আমাকে ষ্টেশন হতে নিয়েও যাবেন তাঁর বাড়ীতে।

আগেই লিখেছি—টোকিওতে অনেক খাল আছে (caual)। সেখানে "উয়েনো পার্ক" চেরীফুলের জন্য ভুবনবিখ্যাত। "চেরীফুল" ফোঁটার সময়ে এখানে হাজার হাজার লোক আসে বাইরে থেকে এবং নানারকম উৎসবের আয়োজন হয়। আরও একটী বিখ্যাত পার্ক আছে, তার নাম হোচ্ছে "সিবিয়া"। এখানে নানারকম খেলা, খাওয়া ও আনন্দ করার অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে। টোকিওতে একটা "বেঁটে গাছ"-এর (Dwarf Trees) বাগান দেখতে যাই। এই বাগানে প্রায় ৩০০ শত "বেঁটে গাছ" আছে। ঐসব গাছগুলিকে ছেঁটে ছেঁটে আড়াই ফুট বা তিন ফুটের বেশী লম্বা হতে দেওয়া হয় না। গাছগুলিকে টবে রাখা হয়। জাপানী ভাষায় এদের বলা হয়— "বনসাই"। এইসব জোর করে ছোট করে রাখা 'বেঁটে গাছগুলিকে' দেখতে বড় অদ্ভুত লাগে। আবার কেন জানি না দুঃখও

হয়। মনে হয় কি নিষ্ঠুর! এদের হাত পা কেটে ছেঁটে বাড়তে দেওয়া হয়নি!

এ দেশের থিয়েটারগুলি ভোরবেলা হতে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত খোলা থাকে। বেটা ছেলেরাই মেয়েদের বেশে অভিনয় করে। তবে মেয়েদেরও আলাদা থিয়েটার আছে। তখনকার যুগে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে অভিনয় করত না। তবে মেয়ে-পুরুষরা নেংটো হয়ে একসঙ্গে স্নান করায় কোনও সংকোচই ছিল না! ভাষা না জানায় অভিনয়ের কিছুই বুঝলাম না। তবে খুব চিৎকার করে অভিনেতাদের নাম ধরে ডাকাডাকি হচ্ছিল। জাপানে নাকি কেউ ভাল অভিনয় করলে হাততালি না দিয়ে নাম ধরে চিৎকার করতে থাকে। থিয়েটার "হলে" বসবার জন্য একটা ঢালা বিছানা ছাড়া আর কোনও আসবাব থাকে না।

বাড়ীওয়ালা এগারো দিন পরে আমাকে ডেকে বলল—তুমি যখন চলেই যাবে, তাই যদি এখুনি যাও তবে বড়ই উপকার হবে। কারণ নূতন একজন ভাড়াটে পাওয়া গেছে। দেরী করলে সে অন্য জায়গায় চলে যাবে, আমার অনেক লোকসান হবে।

বাড়ীওয়ালা বাকী ক'দিনের জন্য, ছোট একটি হোটেলে আমার থাকারও বন্দোবস্ত করে দিল। হোটেলটি খুবই কাছে। মাত্র কয়েকদিনের জন্য আবার বাড়ী বদলানো আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কি করি? বাড়ীওয়ালা তার খুড়োকে দিয়ে আমার এত উপকার করছে কাজেই বাধ্য হয়ে হোটেলে যেতে হলো। হোটেলটি খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ভাড়াও বেশী নয়। জাপানীরা অত্যন্ত গোছানো। ছোট্ট একটু জায়গায় এমন সুন্দর গুছিয়ে সাজিয়ে বসবাস করে যে দেখলে আনন্দ ও তৃপ্তি হয়।

এই হোটেলের বাগানও খুব সুন্দর ও বেশ বড়। রাত্রে খাওয়ার পরে রাস্তায় একটু বেড়াতে বের হলাম। ফিরে এসে দেখি মেঝের ওপর আমার বিছানা পাতা হয়েছে। শুতে যেয়ে দেখি দুটি মাথার

বালিশ পাশাপাশি। প্রায় এক ঘণ্টা ঘুমানোর পর একটি জাপানী মেয়ে এসে আমার বিছানায় বসে আমাকে জাগাল। আমি তো ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মেয়েটি পাশের বালিশ দেখিয়ে কি যেন বল্‌ল। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে বসে থাকলাম। মেয়েটি বাইরে যেয়ে হোটেল-ওয়ালাকে ডেকে আনল।

সে এসে বলল,—তুমি পাশের বালিশটি ফিরিয়ে দাওনি কাজেই আমি মেয়েটিকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এইসব হোটেলের নিয়ম দুটি বালিশ দিয়ে বিছানা পাতা। একটি বালিশ ফেরৎ দিলে, মেয়েদের পাঠানো হয় না। তুমি চাও বা না চাও মেয়েটির জন্য এক রাতের ভাড়া দিতেই হবে।

আমি হাত নেড়ে বল্‌লাম,—তাই হবে। এখন তোমরা বিদেয় হও, আমাকে ঘুমোতে দাও।'

পরের দিন ভোরে উঠেই আমার পুরানো বাড়ীওয়ালার কাছে যেয়ে সব বললাম। সে এসে হোটেল-ওয়ালাকে কি সব বলল। পরে আমাকে বলল,—সব ঠিক হয়েছে। তোমাকে আর মেয়েটির জন্য কিছু দিতে হবে না।

সেদিন হতে আমাকে একটি বালিশই দিত! পরে বাঙ্গালী বন্ধুদের কাছে শুন্‌লাম ঐ রকম ছোট ছোট হোটেল-ওয়ালাদের ওটা একটা "উপরি ব্যবসা"!

তিন দিন পরে টোকিও হতে ইয়োকাহামাতে পৌছে সেই খুড়োর বাড়ীতে উঠলাম। পরের দিনই ঐ খুড়ো আমাকে নিয়ে কাজের খোঁজে জেটিতে গেল। একটা ছোট খাট হিসেব নেওয়ার কাজও পেয়ে গেলাম। চার-পাঁচ দিন পরে জেটিতে এক গুদাম ঘরে বসে কাজ করছি, এমন সময়ে খুব ভাল পোষাক পরা একজন ভারতীয় ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। তিনি তাঁর মালপত্র দেখতে এসেছিলেন। আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। আমি কবে এদেশে এসেছি, কেন এসেছি, কি কাজ করছি সব শুনে তখুনি ঐ কাজ থেকে ছাড়িয়ে

তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ওই ভদ্রলোকটি সিন্ধী, আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করেন। ইয়োকাহামাতেই জাপানী সিল্কের বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্র।

সেই দিনই তিনি আমাকে খাওয়া থাকা ও মাইনে দিয়ে তাঁর অফিসে চাকরী ঠিক করে দিলেন। বল্লেন,—আমার মত এত অল্প বয়সের ও ভদ্রঘরের ছেলের পক্ষে জেটিতে ঐ সামান্য মাইনেয় কাজ করা উচিত নয়।

তিনি ও তাঁর ছোট ভাই চমৎকার সাজানো পাকা বাড়ীতে থাকতেন। আমি বিকেলে যেয়ে খুড়োকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমার সব জিনিষপত্র নিয়ে এলাম। এঁরা দেশ হতে একজন রাঁধুনীও এনেছিলেন। আমি অফিসে কাজ করতাম ও রাজার হালে থাকতাম ও খেতাম। সকলেই আমাকে খুবই ভালবাসতেন ও আদর যত্ন করতেন। এই সিন্ধী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি প্রায় সাত মাস ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে জাপানী ভাষাও বেশ শিখলাম ও অনেক কিছুই দেখ্‌লাম এদের দৌলতে।

জাপানীরা তাদের দেশকে জাপান না বলে "দাই-নিকণ" বলে। এদের দেখ্‌তে খাটো, নাক চেপ্‌টা, চিবুক উঁচু, চোখ ছোট ও গায়ের রং হল্‌দে, অনেকটা নেপালীদের মত। জাপানীরা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত। প্রায়ই বুদ্ধদেবের মন্দিরে যেয়ে বুদ্ধ মূর্তির নাক, চোখ ও নিজেদের নাক, চোখ ছুঁয়ে প্রার্থনা করে,—'হে তথাগত, তোমার নাক. চোখের মত যেন আমাদের নাক চোখ হয়'।

এখানে লেজ শূন্য বেড়ালও খুব দেখা যায়। তাদের প্রায়ই দরজার সামনে রেখে দেয়। কেন যে রাখে বুঝতে পারিনি। অনেকে আবার খুব ছোট চ্যাপটা নাকী কুকুরও পোষে।

এখানে সাধারণ বাড়ীগুলি খুব হালকা কাঠের তৈরী। ছাউনিটা অনেক সময় টালিরও হয়। দেওয়ালগুলি হালকা কাঠের ফ্রেমে সাদা পাতলা কাগজ দিয়ে ঢাকা। এই বাড়ীগুলি বল্‌তে গেলে চারটি

খুটির ওপর একটা বড় ঘর (hall) মাত্র। কিন্তু দরকার হলে দিনে রাতে কাগজের দেওয়াল দিয়ে ভাগ করে ইচ্ছেমত চার-পাঁচটা ঘর করে নেওয়া হয়। ঘরের মেঝে পুরু গদীর ওপর মাতুর দিয়ে ঢাকা। আসবাবপত্র বলতে কিছুই নেই। শুধু কতকগুলি "কুশন" (cushion), কয়েকটি চায়ের বাটী ইত্যাদি, একটা ফুলদানী, জলচৌকীর মত ২।১টি নীচু টেবিল—এই সামান্য জিনিষপত্র। বাড়ীতে ঢোকার দরজাটা মাঝখানে না রেখে একপাশে রাখা হয় ও একটি বাঁশের খিল দিয়ে আটকানো থাকে। ভাগ্যিস এদেশে চোর নেই, নইলে জোরে একটা ধাক্কা দিলেই সব বাড়ী ঘর ভুমিস্যাৎ! জাপানে ভূমিকম্প খুব বেশী হয়। সেইজন্যই এই রকমের হালকা ধরণের বাড়ী ঘর তৈরী করা হয়। এরা ঝড়কে (cyclone) খুবই ভয় করে। ঘরে জানালা রাখে না। কাগজের ভেতর দিয়ে যতটুকু আলো আসে সেইটুকুই যথেষ্ট। জুতো পায়ে দিয়ে কেউ ঘরে ঢোকে না। জুতো বাইরে রেখে কাপড়ের জুতো পায়ে দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয় এইজন্য প্রত্যেকে জাপানীর ঘরের দরজার পাশে অনেক সাইজের কাপড়ের জুতো রাখা হয়। জাপানীরা সব সময়ে হাঁটু গেড়ে পা পেছনে মুড়ে বসে। আমার প্রথম প্রথম ওইভাবে বসার চেষ্টা করতে যেয়ে মনে হতো হাঁটু হুটি বুঝি ভেঙ্গে গেল। পরে অবশ্য বেশ অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। জাপানে ভীষণ শীত। ঘর গরম করার জন্য "হিবাচী" বা "তাওয়ার" আগুন রাখা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই। মনে যেন থাকে আমি যা লিখছি সবই প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা।

রাস্তার পাশ কোনও বাড়ীর সামনে রাশি রাশি জুতো, কাঠের খড়ম দেখলে বুঝাতে হবে এটা একটা মন্দির নয়তো থিয়েটার ঘর। মন্দির যদি হয়, তবে তার সামনে লাল রং-এর দরজা থাকবে। মন্দিরের মাঝখানে একটা লোহার দাণ্ডা ঝোলানো থাকে। তার সঙ্গে অনেক রকম কাগজ নানা রং-এর কাপড়ের টুক্‌রো, ছোট, ছোট আয়নাও ঝোলানো থাকে। প্রাচীনকালে জাপানে বৌদ্ধধর্মের

প্রভাবই বেশী ছিল। এখন অনেক খৃষ্টানও আছে। কিন্তু তাদের উৎসব, আনন্দ, পর্ব, সব বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারেই হয়। জাপানে এক পরিবারেই নানা ধর্মের আত্মীয়রা বেশ একসঙ্গে মিলে মিশে বাস করে। যেমন বাবা-মা "সিন্টো" (জাপানের আদি ধর্ম), ছেলে বৌদ্ধ, ও নাতি খৃষ্টান। এখানে বর্ষাকালে রোজই প্রায় বৃষ্টি হয়। মন্দিরের পুরুতরা ছাতার ব্যবসা করেন। মাসের ১৭'ই তারিখে নাপিতরা কামায় না। এখানে চেরী গাছ খুব আছে। ফলগুলি অতি সুস্বাদু ও লাল টুকটুকে দেখতে। তবে ফুলের আদরই বেশী। "Cherry Blossom" একটা দেখার জিনিষ। বড়ই সুন্দর। কত কবি, কত লেখক-আর্টিষ্ট, কত লোকেই যে এই Cherry Blossom-এর বর্ণনা কত ভাবেই করেছে, এঁকেছে ও লিখেছে তার ঠিক নাই। চেরী ফুল গাছের নীচে কত কবিত্ব, কত রোমান্সই চলে !

জাপানী লেখকরা সব সময় "তুলি" ও রংয়ের বাক্স নিয়ে বসে। একটি তুলি ও কালির খণ্ড দিয়েই সব লেখা হয়। লেখকদের পেন্টিং বাক্সে শুধু কালির খণ্ডই থাকে। জাপানীরা সুন্দর হাতের লেখার খুবই কদর করে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের "মসী" বলে। বিলেতী জুতো, জার্মানীর টুপি, জাপানী "কিমানো" ও নাকে চশমা— এই বেশভূষা দেখলেই বোঝা যায় এরা "মসী"। জাপানীদের পোষাকের নাম "কিমানো", লম্বা পা পর্যন্ত ঢাকা আলখেল্লার মত। হাত দুটি খুব বড় ও ঝোলার মত থাকে। বাজার করে অনেক কিছুই জিনিষপত্র এই হাতের ভেতরে ভরে আনা যায়। এরা সাধারণতঃ বিকেল বেলায় খুব গরম জলে স্নান করে। সকলের বাড়ীর পেছনেই একটু বাগান আছে। সেখানেই স্নানের ব্যবস্থা। স্নানের জন্য আলাদা ঘর থাকে না। আমি অবশ্য তখনকার দিনের সাধারণ গৃহস্থের কথাই লিখছি।

ছোট মেয়েরা তাদের বাচ্চা ভাই বোনদের পিঠের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখে। শুধু হাত দুটি খোলা থাকে। আমাদের দেশের মেয়েদের

মত কোলে করে ঘোরে না। কিন্তু বাচ্চাগুলির অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। কারণ ছোট্ট বাচ্চাদের যাদের ঘাড় শক্ত হয়নি তাদের মাথাগুলি ঝুলতে থাকে একপাশে। মায়েরাও এইভাবে বাচ্চাদের পিঠে বেঁধে ঘরের সব কাজ কর্ম করে।

জাপানের "চা-ঘর" (Tea-House) হচ্ছে একটি বিখ্যাত আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র। জাপানে আছি, অথচ "গেইসা" ও টি-হাউস দেখিনি, এটা আবার কি রকম কথা? কাজেই একদিন মালিকের ভাইয়ের সঙ্গে এক নামকরা টি-হাউসে গেলাম। বাগানের মাঝখানে খুব সুন্দর একটি সাজানো মস্ত বড় ঘর। এখানে শুধু "চা" দেয় না। লাঞ্চ, ডিনার সব পাওয়া যায়। টি-হাউসের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে "গেইসা গার্ল" বা নর্তকীরা। এরা অত্যন্ত রং চং এর ঝক্‌মকে রেশমের "কিমানো" পরে। মাথায় কচ্ছপের বা হাতীর দাঁতের চিরুণী। ঠোটে সিন্দুরের মত লাল রং, অতি সুন্দর ছবির মত হাসিখুসী ভরা চেহারা, ঠিক যেন নানা রংএর সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা গান, বাজনা, নাচ, ঠাট্টা, তামাসা, হাসির গল্প. হাল্কা কঠিন যে কোনও বিষয়ে অতি বিদুষীদের মত আলোচনা করতে পারে। এদের শিক্ষা আদব কায়দা ও অমায়িক নম্র ব্যবহারের তুলনা হয় না। গেইসারা জাপানী সমাজের একটী প্রধান অঙ্গ। বিয়ে পার্বণে, ভোজনে, উৎসবে, পার্টিতে এদের উপস্থিতি চাই-ই। গেইসা ছাড়া জাপানীদের কোনও রকম আনন্দ বা অতিথি-সৎকার সম্পূর্ণ হয় না। এদের শিশুকাল হতে বিভিন্ন পণ্ডিত ও ওস্তাদের কাছে সব রকম বিদ্যা অতি কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে শিখতে হয়। এদের উপার্জনের ক্ষমতা—রূপ ও যৌবনের ওপরেই নির্ভর করে। এত গুণ থাকা সত্বেও এরা "বার-বণিতা" ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাপানে মা বাবা ভাই অভাবে পড়লে যুবতী মেয়ে বোনকে চুক্তি করে গণিকালয়ে বিক্রী করে দেয়। চুক্তি শেষ হলে আবার ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসে। তাদের ভাল বিয়েও হয়। জাপানীদের

ধর্মে বা সমাজে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কোনও দোষও মনে করেনা। এখানে অনেক বিদেশী ব্যবসায়ীরা—যারা বিয়ে করেনি বা বৌকে সঙ্গে আনেনি—তারা অনেকেই জাপানী মেয়ে বিয়ে করে। এতে বৌ-ও পাওয়া যায়, আবার বিনে মাইনেয় রাঁধুনী-ঝি সবই হয়। এরকম বিয়ে করার ইচ্ছে হলে জাপানী চাকরকে বললেই সে যেয়ে খবর দেয়। তখন দলে দলে ঝি জাতীয় মেয়েরা এসে দেখা করে। পছন্দমত একজনকে বেছে নেয়। দুজনে একটা ছোট নীচু টেবিলের দুপাশে বসে চা খেলেই বিয়ে হয়ে যায়! ঐ রকম বিয়ে ইচ্ছেমত ভেঙ্গেও দেওয়া যায়। বিদেশীরা দেশে ফেরার আগে বেশ কিছু টাকা দিয়ে চলে যায়। এতে ঐ সব মেয়েরা কিছু মনে করেনা। তারা টাকা পেয়ে ঘরে ফিরে যায়। সময় ও সুবিধা মত নিজের জাতের লোককে বিয়ে করে ঘর সংসার করে। এসব দেখে মনে হয়, জাপানে অবিবাহিত মেয়েদের চরিত্র বা সতীত্ব বলে কোনও বালাই নেই। শুন্‌লাম আসল বিয়ের পরে মেয়েরা একেবারে "সতী" হোয়ে যায়। কারণ জাপানে বিয়ের পরে অন্যায় কিছু করলে মেয়েদের কঠিন শাস্তি দেয়। জানিনা এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জাপানে এসব বিষয়ে কতদূর উন্নতি বা অবনতি হয়েছে। সত্যিই বিয়ের পরে অনেক মেয়েরা নাকি পর পুরুষদের দৃষ্টি এড়াবার জন্য নিজেদের ভুরু পর্য্যন্ত কামিয়ে ফেলে। আবার "মিশি" দিয়ে মেজে দাঁত ও ঠোঁট পর্যন্ত কালো করে কুৎসিত ও অপ্রিয় হতে চেষ্টা করে।

চুলের আদর বোধ হয় সব দেশের মেয়েরাই করে। তবে আমার মনে হয় জাপানী মেয়েদের মত এত যত্ন ও কষ্ট ভোগ আরও কোনও দেশের মেয়েরা চুলের জন্য করে না। এরা নানাভাবে নানা কায়দায় চুল বাঁধে অনেক দিনের জন্য বেশ টাকা খরচ করে। 'চুল-বাঁধা' যদি নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে রাতের পর রাত একটা কাঠের বালিশে মাথা রেখে ঘুমায়। এ দেশে যারা বেশী দিন আছে ও এদের রীতি-নীতি জানে, তারা জাপানী মেয়েদের খোঁপা দেখলেই বুঝতে পারবে

মেয়েটি সধবা কুমারী কিংবা বিয়ে হয়েছে কিন্তু আবার বিয়ে করার ইচ্ছে আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সবই নাকি চুল বাঁধায় প্রকাশ পায়। জাপানী মেয়েরা কোনও রকম গয়না পরে না। কিন্তু তার বদলে সুন্দরভাবে মাথার খোঁপায় নানাভাবে ফুল সাজিয়ে পরে। বাইরে যাওয়ার সময় একটী কাগজের ন্যাপকিন্, তুটী খাওয়ার "কাঠী" (এ দেশে কাঁটা চামচের বদলে তুটী কাঠী ব্যবহার করা হয়), একটী হাত পাখা, ছোট আয়না, পাউডার, রংএর ডিবে কিমানোর পকেটে নিয়ে যায়। এই সব সরঞ্জামের মধ্যে ডিবেটাই (ভ্যানিটি কেস) সব চেয়ে দরকারী। সেটি যদি আবার হাতীর দাঁতে তৈরী হয় তবে তো কথাই নেই। বেটাছেলেরা তামাক সঙ্গে নেয় বটে কিন্তু দেশলাই নেয় না। কারণ সব জায়গাতেই টবাকো-মালো অর্থাৎ তামাক খাওয়ার জন্য তাওয়াতে আগুন পাওয়া যায়। জাপানের সামাজিক জীবনের অনেকটাই রাস্তার ওপরে কেটে যায়। সেখানে বুড়োরা বসে গল্প করে, ছেলেরা খেলা করে, লেখাপড়া পরে, মেয়েরা চুল বাঁধে, সহরের ভাল মন্দ খবর রটায় ও সন্ধ্যার পর বাজারও বসে। রাস্তায় যান-বাহন খুব কম দেখা যায়। এরা বাঁশের বাঁকের তুধারে মালপত্র চাপিয়ে নিজেরাই কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ দেখা যায়। এরা অত্যন্ত ভদ্র। দরকার হলে সঙ্গে এসে বাড়ি বা রাস্তা চিনিয়ে দিয়ে যায়। গরমের দিনে জাপানীরা যখন ঘরের দরজা খুলে রাখে, তখন রাস্তা থেকে এদের রান্না, খাওয়া ইত্যাদি সবই দেখা যায়। সন্ধ্যার পর ফিরিওলারা এদের অতি প্রিয় খাদ্য "দাইকন্" (পচামূলার তরকারী), সুঁটকী মাছ নিয়ে বের হয়। অন্ধরা ভিক্ষে না করে এই সময়ে বাঁশী বাজিয়ে চলে যায়। অনেকে এদের বাঁশী শুনে ডেকে এনে শরীর টিপিয়ে নিয়ে পয়সা দেয়। অন্ধরা এই বিষয়ে খুব ওস্তাদ ও অনেক টাকা রোজগার করে। ইয়োকাহামা হতে ষাট মাইল দূরে জাপানীদের অতি পবিত্র পাহাড় "ফুজিয়ামা দেখা যায়। জাপানীদের মন প্রাণ যেন এই পাহাড় নিয়েই গড়া। এই পাহাড়ের ফটো পেন্টিং ও আরও অনেক রকমের ছবি

মডেল ইত্যাদি শত সহস্রভাবে আছে। অনেক জাপানী বাড়ীর বাগানে এর প্রতিমূর্তি ও দরজার পর্দায় এই পাহাড়ের ছবি আঁকা আছে। গোঁড়া পুরুতরা কখনও এই পাহাড়ে ওঠেন না। কারণ পাহাড়ে তাঁদের পায়ের ধুলো লাগবে। প্রতি বছরে অনেক লোক এখানে এসে "হারিকারি" (পেট কেটে আত্মহত্যা) বা লাফিয়ে নীচে পড়ে মরে স্বর্গে যায়।

জাপানীরা অতি ভদ্র ও বিনয়ী। দুজন লোকের যদি রাস্তায় দেখা হয় তবে নমস্কার বা কেমন আছেন না বলে, দুই হাটুর ওপর দুহাত রেখে যেমন মুসলমানরা নমাজের সময় মাথা নীচু উচু করে সেই রকম করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে 'পেটের অবস্থা কেমন,' 'পূর্ব পুরুষরা কেমন আছেন,' 'পরিবারের সকলে কে কেমন আছে'—এই সব নিয়ে কথাবার্তা চলে। সরু রাস্তা হলে অন্য লোকের চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

সে যাক্—সাত-আট মাসের মাইনে সবই প্রায় জমিয়ে ছিলাম। নেহাৎ দরকারী জিনিষ ছাড়া আর কিছুই কিনিনি। হিসেব করে দেখলাম আমেরিকা যাওয়ার ভাড়া ছাড়াও আরও কিছু টাকা জমেছে। মালিক মিঃ করমচান্দানীকে আমেরিকা রওনা হওয়ার কথা বলতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—কত টাকা আমার জমেছে ?

তাঁকে তা জানাতে তিনি বললেন,—জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীতে না যেয়ে যেন প্রথম শ্রেণীতে যাই। যা বেশী টাকা লাগবে তিনিই সবটা দিয়ে দেবেন।

ভদ্র লোকের উদারতায় আমার কি যে আনন্দ হলো সেটা আমি বুঝিয়ে লিখতে পারব না কোনও দিনও। এত যুগ পরেও তাঁর কথা মনে হলে ভক্তি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুইয়ে আসে। প্রথম থেকেই I. F. S. চাকরী নিয়ে দেশে না ফেরা পর্যন্ত কত লোকের কাছ হতেই যে অজস্র ভালবাসা সাহায্য ও বন্ধুত্ব পেয়েছি, তা লিখে শেষ করতে পারব না।

পরের দিন জাহাজ অফিসে টিকিট কেনার সময়ে জানতে পারলাম যে "ট্রোকমা ও হুক্ওয়ার্ম" নেই—এই রকম সার্টিফিকেট না দেখালে টিকিটই কিনতে দেবে না। হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারদের পরীক্ষার পরে আমার ওই হু'রকম রোগ নেই লেখা সার্টিফিকেট নিয়ে আবার জাহাজ-অফিসে যেয়ে টিকিট কিনলাম। ডাক্তারদের কাছে শুনলাম —"ট্রোকমা" এক রকম চোখের অসুখ ও ভীষণ ছোঁয়াচে। "হুক্ওয়ার্ম" শরীরের রক্ত চুষে নিয়ে মানুষকে নির্জীব করে দেয়। আমেরিকায় ঐ রকম চোখের ছোঁয়াচে রোগ ও "হুক্ওয়ার্মের" আল্সে ও নির্জীব লোকদের ঢুকতে দেয় না। জাহাজে ৩'য় শ্রেণীর যাত্রীদের সার্টিফিকেট থাকলেও আট দিন "quarantine" এ রেখে দেয়। আবার পরীক্ষা করে তবে যাত্রীদের ছেড়ে দেয়। যদি কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে তবে ঐ জাহাজেই ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। এই জন্যই মিঃ করমচান্দানী আমাকে ৩'য় শ্রেণীর যাত্রী হতে নিষেধ করেছিলেন। তিনিই ব্রিটীশ কনসালের এর কাছে যেয়ে আমার পাসপোর্ট ইত্যাদি ঠিক করে আনলেন। আমি "সান্‌ফ্রানসিস্‌কোর" টিকিট কিনলাম।

জাহাজ ছাড়তে তখনও আট দিন বাকী ছিল। আনন্দে উৎসাহে ও ভয়ে এ কটা দিন কেটে গেল। ভয় হয়েছিল—এবার সত্যি, সত্যিই "সাদার দেশে" চল্‌লাম। ভয় তো হওয়ারই কথা।

মিঃ করমচান্দানী সব বন্দোবস্ত করে জাহাজঘাটে এসে ২'য় শ্রেণীর ভাড়া দিয়েও আমার হাতে ৫০ ডলার দিয়ে বললেন—রেখে দাও—কাজে লাগবে।

তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাষা খুঁজে পেলাম না। এত দয়া, এত উদারতা ভরা মহৎ লোকদের কথা শুধু বইতেই পড়েছিলাম। এখনও এই বুড়ো বয়সে তাঁর মত শুভাকাঙ্ক্ষীর কথা মনে হলে ভাবি যে 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' এর মত লোক এখনও দেখা যায়।

—দুই—

আমেরিকার পথে

বেলা দু'টায় জাহাজ ছাড়ল। জাপানের সেই বিখ্যাত তীর্থ "ফুজিয়ামা" পাহাড়ের চূড়াও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল আমি ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

সন্ধ্যার পর নিজের কেবিনে এসে জিনিষপত্র খুলে গুছিয়ে রেখে আবার ডেকে বসলাম। খুবই দুঃখ হচ্ছিল। কলকাতা হতে জাপানে আসার সময় জাহাজে সব বাঙ্গালী ও ভারতবাসী যাত্রীদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল, যেন একটা পরিবারের মাঝে আমিও একজন ছিলাম। জাপানে এসেও মিঃ করমচান্দানীর মত মহৎ লোকের আশ্রয়ে ছিলাম। এখন আমি একেবারেই একলা—শুধু সন্ধ্যাতারাটি ছাড়া সবই অপরিচিত।

আমি প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে ভেসে চললাম অতি বড় মহাপুরুষ এব্রাহাম লিঙ্কনের বিশাল স্বাধীন দেশ আমেরিকায়, যাঁর কথা ছোটবেলা হতেই পড়েছি ও শুনেছি। নিগ্রো দাস-দাসীদের মুক্তির সংগ্রামে তাঁর কত চেষ্টা, কত যুদ্ধ। শেষে গুলির আঘাতে মৃত্যু। সে সব পুণ্য স্মৃতি সবই মনে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ ডেকে থাকার পর নীচে এসে খেয়ে কেবিনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দু'তিন দিনের মধ্যেই কয়েকটী জাপানী ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তাদের ইংরেজী ভাষাটা আমার ইংরেজীর চেয়ে খুব বেশী উঁচু ছিল না। কাজেই বেশ একটু সাহস হলো এই ভেবে যে "সাদার দেশে" আমি একেবারে হাবুডুবু খাব না। তারা যদি এই ইংরেজী বিদ্যে নিয়ে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারে তবে আমিই বা পারব না কেন? তবে তাদের টাকার জোর অনেক ছিল, যেটা আমার

ছিল না। তারা সকলেই ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রী। সেখানে রোজই গান, বাজনা, বক্তৃতা, থিয়েটার, সিনেমা ও অনেক রকম খেলা ইত্যাদি হতো সময় কাটানোর জন্য। কেউ যেন একঘেঁয়ে দিন কাটানোর জন্য হাঁপিয়ে না ওঠে। চারদিকে তো শুধু জল আর জল। ঐ সব জাপানী ছাত্রেরা আমাকে সব সময়েই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য সাদরে ডেকে নিয়ে যেত। যদিও সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী আমি, অন্য সব ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রীরা সেজন্য কোনও আপত্তি করত না, যা এই যুগে আমরা ধারণাই করতে পারি না। তবে এই জাহাজটি জাপানী কোম্পানীর। কয়েকজন মাত্র "সাদা-সাহেব" ছাড়া আর সকলেই জাপানী ও চীনা যাত্রী। দশ-বারো দিন একভাবে জলের ওপরে থেকেও মহা-সাগরকে আমার খুবই ভাল লাগছিল। একটু বিরক্ত বা এক ঘেঁয়ে লাগছিল না। ওপরে অসীম অনন্ত নীল আকাশ, নীচেও সীমাহীন অগাধ জলরাশি, ঢেউ-এর পর ঢেউ দিয়ে ভরা। মহাসাগরের কথাও যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। সে যেন এক অজানা অসীমের বাণী।

হনোলুলু

মনে হলো খুব পরিচিত দেশ হনোলুলুতে এলাম। যদিও এর সঙ্গে পরিচয় শুধু ভূগোলের বইতেই ছিল। কেন জানি না ভূগোলের মাস্টারমশায় যখন তখন আমাদের জিজ্ঞেস করতেন যে হনোলুলু কোথায়, দেশের ও লোকের রীতি-নীতি, কাদের দেশ, কি জাতি, কি ধর্ম ইত্যাদি নানারকম প্রশ্ন।

হনোলুলু প্রশান্ত মহাসাগরের "ওপু" দ্বীপে অবস্থিত অতি সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। "টেন-টেলাম" পাহাড়ের পাদদেশে, গাঢ় সবুজে ঢাকা নানারকম অসংখ্য গাছ ও ফুলে-ফলে ভরা এই অপূর্ব সুন্দর আধুনিক সহরটি। কিছুদূরেই পৃথিবী বিখ্যাত সমুদ্র-তট— "ওয়াইকিকি"।

জাপানী ছাত্রদের সাথে ট্রামে সন্ধ্যাবেলায় ওখানে বেড়াতে গেলাম। আমি বাদে আমার সঙ্গীরা সকলেই সাঁতার কাটল। স্নানের জন্য এরকম নিরাপদ সমুদ্র নাকি পৃথিবীতে আর নেই। এ দেশের লোকরা খুবই আমোদপ্রিয় ও অতি মিষ্টি গীটার বাজায়। ঐ বাজনা শুনে শুনে সারাদিন সারারাত বালুর ওপরে বেশ কাটানো যায়। বাজনা ছাড়াও সারাক্ষণ এখানে নাচ, গান, খেলা, নানারকম এদেশীও খাবার প্রচুর মেলে। হনোলুলু'কে পৃথিবীর অতি মনোরম প্রমোদ-উদ্যান বলা চলে। পরের দিন সকালবেলা খাওয়ার পর ওই ছেলেদের সাথেই "পাঞ্চ বেলা" পাহাড়ের শিখরে উঠে "পার্ল-হারবার" হতে "ডায়মণ্ড-হেড" পর্যন্ত অতি সুন্দর দৃশ্য দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। ফেরবার পথে এখানের বিখ্যাত বিশপ-মিউজিয়ামে নানারকম বিচিত্র সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখলাম। প্রাকৃতিক দিক দিয়ে হনোলুলু সত্যিই এক পরম রমণীয় অদ্ভুত মনোহর দেশ। এমন সুন্দর দেশ আর কোথাও বুঝি নেই। আমার মাস্টারমশাই এই সব পড়ে ও শুনেই বোধহয় এই দেশের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যদিও তিনি কোনও দিন এসব দেশ চোখেও দেখেন নি শুধু বাঁশীই শুনেছিলেন। আমি তাঁকে পাঁচ-ছখানা ছবির পোষ্টকার্ড ও মস্ত লম্বা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। এখানের আনারস পৃথিবী বিখ্যাত। পেপে, আখ, কলা, তরমুজ, ফুটী ইত্যাদি নানারকম ফল প্রচুর পাওয়া যায়। রাস্তায় আসতে আসতে দু'ধারে শত, শত বিঘা জমিতে ঐ সব ফলের বাগান দেখলাম। বেশীর ভাগই আমেরিকায় চালান যায়।

আমেরিকা

ছয়দিন, ছয়রাত চলার পর আমরা সামনে দেখতে পেলাম ক্যালিফোরনিয়ার তীর ও সিরিয়া-ন্যাভার পাহাড়। কয়েক ঘণ্টা পরেই সানফ্রানসিসকো সহরে এসে পৌঁছলাম। কি যে আনন্দ ও উৎসাহ হয়েছিল! ভাবছিলাম, আমি সেই বরিশালের অতি ক্ষুদ্র

এক আজানা গ্রামের ছেলে. বিনা সম্বলে এই পুণ্যতীর্থে—ওয়াশিংটন, জেফারসন, লিঙ্কন প্রভৃতি মহাপুরুষদের স্বাধীন দেশে এসেছি। এ যে আমার ধারণার অতীত।

এখানে বলে রাখি যে আমেরিকায় যখন কলেজের কোনও উৎসবে সব স্বাধীন দেশের জাতীয়-পতাকা উত্তোলন করে দিত, তখন ছাত্ররা আমাকে জিজ্ঞেস করত—রয়, তোমার দেশের পতাকা কোনটি ?

লজ্জায় দুঃখে অপমানে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক দেখিয়ে বলতাম,—ওই আমাদের পতাকা !

যাক্, জাহাজটি আস্তে আস্তে এসে জেটিতে থামল। সিঁড়ি ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলি কাষ্টম্ অফিসার, ডাক্তার. ইন্স্পেকটার—সকলে এসে জাহাজে উঠ্লেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা এক ঘণ্টার মধ্যেই নেমে গেল। আমাদের—অর্থাৎ ২'য় শ্রেণীর যাত্রীদের—নানা রকম জেরা করার পর একে একে ছেড়ে দিল। আমি প্রায় বেলা দুটোর সময় নেমে এলাম। বাক্সগুলি এক্সপ্রেস কোম্পানীর জিম্মায় রেখে শুধু একটা স্যুটকেস হাতে করে গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তায় শুধু সাদা লোকের স্রোত। সকলেই যেন দৌড়ে চলেছে। মনে হয় তাদের খুবই দরকার, সময় নষ্ট করা অসম্ভব ! একটু দূরে এসে স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখে লোকজন দোকান পসার দেখতে লাগলাম।

সাদা লোকের সাথে কথা বলতেই ভয় হচ্ছিল। দশ-পনেরো মিনিট পরে আবার চল্তে আরম্ভ করলাম। কিছু দূরে এসে একজন পুলিশকে অনেক সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম,—কি করে বার্কলে সহরে যেতে হয় ?

ক্যালিফোর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়টি সেখানে আছে। জাপানে থাকতেই শুনেছিলাম সেখানে ৪-৫ জন ভারতীয় ছাত্র আছে।

পুলিশটি আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বলল,—এক ব্লক আপ ও দুই ব্লক ডাউন গিয়ে যে রাস্তাটা পড়বে সেখানে ট্রাম পাবে।

আমেরিকান পুলিশের নাকী সুরের কথা বেশ বুঝতে পারলাম কিন্তু ব্লক কাকে বলে কিছুই বুঝলাম না। আমাদের দেশে বা জাপানে ব্লকের কথা কিছুই শুনিনি। যাক্, ভয়ে আর জিজ্ঞেস না করে পুলিশের আঙ্গুল অনুসারে চলতে লাগলাম। যখন দেখলাম পুলিশটি আর আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তখন আর একটি পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম। সে রাস্তা দেখিয়ে বলল—দুই ব্লক গেলেই মেন স্ট্রীট পাবে।

একটু হাঁটার পরেই সেই রাস্তায় এলাম। এতক্ষণ পরে ব্লকের একটা ধারণা হলো। মেন স্ট্রীট হচ্ছে প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা, দুধারে বড় বড় সুসজ্জিত দোকান, হাজার হাজার লোক—ট্রামে, বাসে, মোটরে হেঁটে যাতায়াত করছে। সকলের এত তাড়াতাড়ি হাঁটা দেখে মনে হচ্ছিল কি যেন জিনিস হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্য অত ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে!

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে জনতার ভীড় প্রাণ ভরে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম,—কোন্ ট্রামটা বার্কলে সহরে যাবে?

সে বল্‌ল—কোনও ট্রামই বার্কলেতে যাবে না। সব ট্রামই গোল্ডেন-গেট খেয়াঘাট পর্যন্ত যাবে।

সামনে একটা ট্রাম আসছে দেখে স্যুটকেস হাতে নিয়ে দাঁড়ালাম। ট্রামে উঠ্‌তে যেয়ে দেখি খুব দামী ও ভাল পোষাক পরে সাহেব মেমরা বসে আছে। ভয়ে আর উঠলাম না। দু-তিনটি ট্রাম চলে যাওয়ার পর সাহস করে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম,—দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রাম কখন আসবে?

সে একটু সন্দিহান হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,—আমেরিকায় অন্য কোনও শ্রেণীর ট্রাম নেই—সবই এক শ্রেণীর।

তখন 'দুর্গা দুর্গা' করে পরের ট্রামে উঠলাম। কেউ কিছু বল্‌ল না, বরং একজন একটু সরে বসবার জায়গা করে দিল। আমেরিকায় বর্ণ-বিদ্বেষ-এর কথা জানা থাকাতে সব সময়েই বেশ ভয় হতো কি জানি কেউ যদি "কালো-মানুষকে" অপমান করে

মা দুর্গার মাহাত্ম দেখে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করলাম। খেয়াঘাটে পৌছানর পর মিনিট পাঁচের মধ্যেই ষ্টীম-লঞ্চ এসে গেল। তখন অনেকটা ভয় ভেঙ্গে গেছে। দেরী না করে সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে লঞ্চে উঠে বসলাম। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই ওপারে এসে আবার ট্রামে উঠলাম। সানফ্রান্সিসকো হতে বার্কলে পৌছতে মাত্র আধ ঘণ্টা লাগে।

বার্কলে

এখানে আমি কোনও ভারতীয় ছাত্রের নাম বা ঠিকানা জানতাম না। শুধু জাপানে ছেলেদের কাছে শুনেছিলাম যে মিঃ দাম নামে একজন বাঙ্গালী এখানে থাকেন।

ট্রামে টিকিট কেনার সময় কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম,—ট্রামটি কি কোনও পোষ্টাফিসের সামনে দিয়ে যাবে?

সে হ্যাঁ বলাতে আমি তাকে অনুরোধ করলাম যে আমাকে যেন পোষ্ট-অফিসের কাছে নামিয়ে দেয়।

কণ্ডাক্টারকে ধন্যবাদ দিয়ে পোষ্ট-অফিসের কাছে নেমে গেলাম। কলকাতায় কলেজ স্ট্রীটের 'ওয়াই এম সি এ'-এর রেভারেণ্ড বার্বার সাহেব আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যে 'প্লিজ' ও 'থ্যাঙ্ক ইউ' কথা দুটি যেন সব সময়ে সাদাদের দেশে ব্যবহার করি।

পোষ্ট-অফিসে ঢুকে দেখি এক মেমসাহেব বসে আছেন।

জিজ্ঞেস করলাম,—পোষ্টমাষ্টার কখন আসবেন?

তিনি বললেন—আমিই পোষ্টমাষ্টার।

সে কি রকম! মেয়েমানুষ আবার পোষ্ট-মাষ্টার হয় নাকি? ভাবলাম "কালা-আদমী" দেখে একটু মস্করা করল নাকি? যাক্ বিশ্বাস করতেই হলো। যে দেশে যে রকম রীতি নীতি! জিজ্ঞেস করলাম,—কোনও ইণ্ডিয়ান ছাত্রের নাম ঠিকানা জানেন নাকি?

উত্তরে বললেন—তিনি এখনও পর্যন্ত কোনও "ইণ্ডিয়ান ছাত্র"এখানে দেখেননি। আমি "ইণ্ডিয়ান ছাত্র" কিনা, কোন "রিজাভ" হতে এসেছি জানতে চাইলেন। আমি কলকাতা হতে এসেছি শুনে বললেন,— ও তুমি হিন্দু! আমি ভেবেছিলাম "রেড ইণ্ডিয়ান"।

আমেরিকায় সকল ভারতবাসীকেই "হিন্দু" বলে—তারা মুসলমানই হোক আর খ্রীষ্টানই হোক। "ইণ্ডিয়ান বললে ভাবে "রেড ইণ্ডিয়ান"। আরও বললেন—এখানে প্রায় ছ-সাত জন হিন্দু ছাত্র আছে। একটু অপেক্ষা কর। এখুনি কেউ না কেউ চিঠি নিতে আসবে।

সুটকেসটা রেখে বসে রইলাম। কয়েক মিনিট পরেই একটী ভারতীয় ছেলে এসে তাঁর চিঠি পত্র নিলেন। পোষ্ট-মাষ্টারণী কি বলাতে আমার কাছে এসে আমার নাম-ধাম, কেন এসেছি সব শুনলেন। ছেলেটি পাঞ্জাবী। মিঃ দাম কোথায় আছেন জিজ্ঞেস করাতে বললেন —তিনি তো এখান থেকে চলে গেছেন। তবে খুব কাছেই একটি বাঙ্গালী ছাত্র থাকেন। তাঁর নাম ঠিকানা দিয়ে কোন রাস্তায় যেতে হবে সব বুঝিয়ে বলে চলে গেলেন।

আমি সুটকেসটা নিয়ে প্রায় আধ মাইল হেঁটে তাঁর বাড়ী পৌছলাম। দরজার "বেল" টিপতেই বাড়ীওয়ালী এসে দাঁড়াল। মিঃ মজুমদার আছেন কিনা জিজ্ঞেস করতে দরজা খুলে চার নম্বর ঘরে যেতে বললেন।

আমাকে দেখে মিঃ মজুমদার মহা খুসী। অতি আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে বললেন—আপনি বাঙ্গালী? বসুন, বসুন! কতদিন পরে একজন বাঙ্গালীকে পেলাম!

তিনি চা খেতে বাইরে যাচ্ছিলেন আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে এক রেষ্টুরেণ্টে পেট ভরে খাইয়ে অনেকক্ষণ বসে গল্প করলেন। সব শুনে বললেন—যে কাজ না পাওয়া পর্যন্ত আমি তাঁর ঘরে অর্ধেক ভাড়া দিয়ে থাকতে পারব। তাতে দুজনেরই সুবিধা হবে। টাকাও খুব কম লাগবে।

খুবই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করলাম তাঁর সঙ্গে থাকতে। তাঁর ঘরটা ডবল রুম ছিল অর্থাৎ তুটী খাট বিছানা ছিল। আনন্দে ও উৎসাহে সে রাতে ভাল ঘুম হলো না।

ভোরে উঠেই কাপড় জামা পরে রাস্তায় বেড়াতে গেলাম। ফিরে এসে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ মজুমদার উঠলেন ও তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করে বের হওয়ার সময় বললেন যে, তিনি এক বাড়ীতে কাজ করেন ও সেইখানেই খান। আমিও একটু পরেই আগের দিনের সেই রেষ্টুরেণ্টে খেতে গেলাম। একটি মেয়ে ওয়েট্রেস এসে জিজ্ঞেস করল—"ঠাণ্ডা না গরম" কি খাবে ?

আমি তো কিছুই বুঝতে না পেরে আন্দাজে বললাম—গরম।

তখন গরম "পরিজ" তুধ চিনি এনে দিল। পরিজ খাওয়ার পরে ভাজা ডিম, টোষ্ট, মাখন, জ্যাম, কফি দিল। খেয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে বারোটার সময় ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। যথেষ্ট ক্ষিধে পাওয়া সত্ত্বেও ভয়ে খেতে গেলাম না। কারণ শুনেছিলাম এদেশে সকলেই গরুর মাংস খায়। বিকেলে পেট ভরে চা ও খাবার খেলাম।

সন্ধ্যার সময় মিঃ মজুমদার ফিরলে তাঁকে খাওয়ার সমস্যার কথা বললাম। তিনি বললেন—আমাদের দেশে যেমন ডাল ভাত মাছ প্রধান খাদ্য, এ দেশেও তেমনি গরুর মাংস ও আলুই প্রধান খাদ্য। আমাদের মত যে সব ছেলেদের কাজ করে খেতে ও কলেজে পড়তে হয়, তাদের অত বাছ-বিচার করা চলে না। আমরা সকলেই ঐ মাংস খাই, তুমিও কোনও রকম দ্বিধা না করে খেতে চেষ্টা কর। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে, শেষে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই উপদেশ দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমিও আস্তে আস্তে যেয়ে সেই রেষ্টুরেণ্টে খেতে বসলাম। খাবারের তালিকা পড়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আন্দাজে দাম দেখে দেখে সব চেয়ে সস্তার তিন রকমের খাবারের অর্ডার দিলাম। প্রথমে "সুপ" দিল। গরম গরম

'স্যুপ' বেশ লাগল। সবটাই খেয়ে ফেললাম। মাংস দিল—"হ্যাম—বার্গ ষ্টেক"। অতবড় একখণ্ড প্লেট জোড়া মাংস দেখে আর খেতে ইচ্ছে হলো না। তবে তার সঙ্গে যে ঝোলটা (gravy) ছিল তাতে সেদ্ধ আলু ও বাঁধাকপি মিশিয়ে বেশ করে খেলাম। পুডিং ও গরম "কফি" খুবই ভাল লাগল। রুটী মাখন তো প্রচুর ছিল। যাক খাওয়ার "ফাঁড়া" কাটিয়ে বাড়ীতে ফিরে মহা আনন্দে মিঃ মজুমদারকে সব বললাম। তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করলাম—কোথায়, কি কাজ, কেমন করে যোগাড় করতে পারি? এভাবে বসে খেলে সব টাকা ফুরিয়ে গেলে এই বিদেশে ভীষণ মুস্কিল হবে।

তিনি বল্লেন—একটা স্থানীয় খবরের কাগজ কিনে, বিজ্ঞাপন দেখে কোনও কাজ খালির সংবাদ থাকলে সেখানে যেয়ে খবর নাও। এইভাবে দু'তিন দিনের মধ্যেই নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।

পরের দিন সকালে কাগজ কিনে দুটি কাজ যা আমার পক্ষে সম্ভব হবে বেছে নিয়ে সেই ঠিকানায় যেয়ে খোঁজ করলাম। দুজন বাড়ীওয়ালীই বলল তারা লোক পেয়ে গেছে। বেলা দশটার মধ্যেই বাড়ী ফিরে এলাম। পরের দিন রবিবার। মিঃ মজুমদার আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় দেখাতে নিয়ে গেলেন। "সিরিয়া-ন্যাভাডা" পাহাড়ের পাদদেশে এক কম্পাউণ্ডের মাঝে সব কলেজগুলি অবস্থিত। এই পাহাড়ের গায়ে লাগা এক গ্রীক ধরণের অ্যাম্ফি থিয়েটার (গোলাকার মঞ্চ) অতি চমৎকার। ফেরার পথে দুটি বাঙ্গালী ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলো।

বেলা একটার সময় ফিরে সেই রেষ্টুরেন্টে দুজনে খেতে গেলাম। এবার মিঃ মজুমদারের কাছে বেশ করে "Menu"র রহস্যটা বুঝে নিলাম। ওঁকে কথায় কথায় বললাম—আমি সিয়াটেল সহরেই যাওয়া ঠিক করেছি।

উনিও বললেন—হ্যাঁ, সেখানের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নাম আছে।

পরের দিন বার্কেলে হতে সিয়াটেল যাওয়ার সব খবর নিতে আরম্ভ করলাম। শুনলাম সিয়াটেল যেতে ভাড়াই লাগবে ত্রিশ ডলার। তবে যদি সান্‌ফ্রানসিস্‌কো হতে জাহাজে যাই মাত্র পনেরো ডলার লাগবে, প্রায় অর্দ্ধেক ভাড়া। ওই লাইনের জাহাজগুলি সানডিয়াগো হতে আলাস্কার রাজধানী নোম পর্যন্ত যাতায়াত করে। কলেজ খোলার অনেক দেরী ছিল। ভাবলাম—জাহাজে অনেক রকম কাজ থাকে যেটা আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে। যদি একটা কাজ যোগাড় করতে পারি, তবে বিনাভাড়ায় যেতে পারব ও একটা নূতন দেশ আলাস্কাও দেখা হবে।

এই ভেবে একদিন সানফ্রানসিস্‌কোতে যেয়ে জাহাজ কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। শুনলাম তিনি সহরের বাইরে গেছেন, তিনদিন পরে ফিরবেন।

মিঃ মজুমদারকে আমার উদ্দেশ্যটি খুলে বলাতে তিনি খুব হাসতে লাগলেন। বল্‌লেন—প্রথমতঃ প্রেসিডেন্ট তোমার মত একজন সামান্য লোকের সঙ্গে দেখাই করবেন না। তারপর ইণ্ডিয়ানকে কখনই জাহাজে কাজ দেবে না।

পরের দিন বিকেলে পাঁচ-ছ'টি ভারতীয় ছাত্র বেড়াতে আসলেন। আমার জাহাজে কাজ নিয়ে "নোম" যাওয়ার চেষ্টার কথা শুনে সকলেই একবাক্যে বলে উঠলেন—ওসব কাজ শুধু সাদা আদমীদের জন্য। কালো আদমীকে কখনই দেবে না।

আমি উত্তর দিলাম—শুধু একটু চেষ্টা করছি, যদি কাজ নাই পাই, তবে টিকিট কিনে যাত্রী হয়েই যাব।

চারদিন পরে আবার সানফ্রানসিস্‌কো তে যেয়ে জানলাম প্রেসিডেন্ট ফিরেছেন ও অফিসেই আছেন।

এক টুক্‌রা কাগজে আমার নাম—"বিজয়কুমার রায়, হিন্দু ছাত্র, কলিকাতা" লিখে পাঠিয়ে দিলাম। মিনিট কয়েক পরেই আমাকে

ডেকে পাঠালেন। ভেতরে যেতেই প্রেসিডেণ্ট আমাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন—তিনি আমার জন্য কি করতে পারেন ?

আমি তখন তাঁকে সব খুলে বললাম। আমার উচ্চারণের দোষে অনেকগুলি কথা বুঝতে না পেরে ওই শব্দগুলি বানান করে বলতে বললেন। এতবড় একজন অফিসার—জাহাজ কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট—অথচ কত ধৈর্য ধরে আমার সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বলা সব কাহিনী শুনলেন।

সব শুনে বললেন—"আমি সঠিক এখন কিছু বলতে পারি না, তুমি পরশু দিন এসে আমার সঙ্গে আবার দেখা করো।

কিছু হবে না—বলে সোজাসুজি বিদায় না দেওয়াতে আমার বেশ একটু আশা হলো। প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারী আমাকে বাইরে পৌঁছে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি থিওজফিস্ট ?

আমি "না" বলাতে আর কিছু বললেন না। রাস্তায় যেতে যেতে কেবলই মনে হচ্ছিল আমি থিওজফিস্ট কিনা কেন একথা জিজ্ঞেস করলেন ? "ইণ্ডিয়ান মিরার" খবরের কাগজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন সেন ছাড়া আর কোনও থিওজফিস্টকে আমি চিনি না। তাঁর বাড়ীতেই একদিন মিসেস এ্যানী বেসান্তকে দেখেছিলাম।

সন্ধ্যাবেলা, বাড়ী ফেরার পর মিঃ মজুমদার জিজ্ঞেস করলেন—কি হলো ?

আমি শুধু বললাম—এখনও কিছু ঠিক হয়নি। আরও দু' চার দিন ঘুরে দেখব।

তিনি হেসে বললেন—ঐ রকম বুনো হাঁসের পেছনে না ঘুরে টিকিটটা কিনে ফেললেই সব বিষয়ে ভাল হতো।

নির্দিষ্ট দিনে আবার সানফ্রানসিস্‌কোতে যেয়ে প্রেসিডেণ্টের কাছে কাগজে নাম লিখে পাঠিয়ে দিলাম। সেক্রেটারী এসে সুন্দরভাবে সাজানো একটি ঘরে আমাকে নিয়ে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে সেই সেক্রেটারীই আমাকে প্রেসিডেণ্টের কাছে নিয়ে গেলেন।

প্রেসিডেণ্ট উঠে দাঁড়িয়ে—"গুড মর্নিং" বলে সেকহ্যাণ্ড করলেন। বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন,—আমি কি কেবিন-বয়ের কাজ করতে প্রস্তুত আছি ?

আমি অতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে স্বীকার করলাম।

আমার হাতে দু'খানা খোলা চিঠি দিয়ে বল্‌লেন—একখানা জাহাজের ক্যাপ্টেনকে দেবে ও আর একখানা চীফ স্টুয়ার্ডকে দেবে। জাহাজের নাম চিঠির ওপরেই লেখা ছিল। আরও বল্‌লেন—১৫'ই জাহাজ ছাড়বে, ১৪'ই যেন সব কাজ বুঝে নিই। আমাকে শুভেচ্ছা (Best of luck) জানিয়ে আবার সেকহ্যাণ্ড করে বিদায় দিলেন।

সেই সেক্রেটারী আমাকে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারলাম না কেন প্রথম দিন তিনি আমাকে থিওজফিস্ট কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন ?

উত্তরে বললেন—প্রেসিডেণ্ট থিওজফির খুবই ভক্ত। তুমিও হিন্দু, তাই ভেবেছিলাম বোধ হয় থিওজফিস্ট হতে পার।

তখন বুঝতে পারলাম কেন আমার চাকরী হলো এত "সাদার মাঝে"। এবার মা দুর্গা, মা কালীকে প্রণাম না করে মিসেস এ্যানি বেশান্তকেই মনে মনে প্রণাম করলাম। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন ভাবে হিন্দু ধর্ম আমেরিকায় প্রচার করেছিলেন, মিসেস এ্যানী বেশান্ত তাঁর চেয়ে অনেক বেশী থিওজফি এই দেশে প্রচার করেছিলেন।

একটা "টেলিফোন বুথে" ঢুকে চিঠি দু'খানা পড়লাম। ক্যাপ্টেনের চিঠিতে কাজে নিযুক্ত করার আদেশ দিয়ে লেখা ছিল, "মিঃ বিজয়কুমার রায় কলেজের ছাত্র, হিন্দু। তাকে কেবিন বয়ের কাজ দেওয়া হলো। ১৪'ই হতে কাজে যোগ দিবে।" চীফ-ষ্টুয়ার্ডের চিঠিতে লেখা ছিল—"মিঃ বিজয়কুমার রায়, আর কখনও কাজ করে নি। সহানুভূতির সঙ্গে অনুগ্রহ করে যেন কাজ-কর্ম শিখিয়ে দেওয়া হয়।"

আমার মনের অবস্থা ও উৎসাহ বোধহয় কারও বুঝতে কষ্ট হবে না। যাকে বলে "ঠেকেই শেখে"। আমিও দেশ ছেড়ে আসা অবধি ঠেকে

অনেক কিছুই শিখেছি ও শিখছি। নইলে কোন সাহসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বানান করে কথা বলে এতবড় জাহাজ কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের কাছে সোজা চলে গেলাম? কে আমাকে পথের নিশানা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

মনের আনন্দে সারাদিন ট্রামে বাসে হেঁটে "সানফ্রানসিস্‌কো" সহরটি ঘুরে দেখলাম। একটা রেষ্টুরেণ্টে দামী দামী খাবারের অর্ডার দিয়ে অনেকদিন পরে খুব পেট ভরে খেলাম। শেষে ষ্টীমারে চড়ে গোল্ডেন-গেট পেরিয়ে অনেকদূর বেড়িয়ে এলাম। এটি একটি অতি সুন্দর জায়গা। পৃথিবীর মধ্যে নাকি 'তৃতীয় সুসজ্জিত বন্দর।'

সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে দেখি মিঃ মজুমদারের ঘরে পাঁচ-ছ'জন ভারতীয় ছাত্র বসে গল্প করছেন। সান্‌ফ্রানসিস্‌কো সহরটি সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে দেখার বিবরণ তাদের দিলাম। মিঃ মজুমদার একটু অন্যমনস্ক ভাবে শুনে জিজ্ঞেস করলেন—আসল কাজের কি হলো?

আমি তাঁর হাতে চিঠি দু'খানা দিলাম। চিঠি পড়ে অবাক হয়ে তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আর সব ছেলেরাও চিঠি দু'খানা পড়ে চুপ হয়ে গেলেন! কেননা সকলেই এক বাক্যে বলেছিলেন—জাহাজে কালো আদমীকে কখনই কাজ দেবে না।

একজন বললেন—আমরা তো এত বছর এখানে আছি, কেউ তো আমাদের তাকিয়েও দেখে না। আর তুমি একেবারে সদ্য আনকোরা কাঁচা ছেলে সোজা জাহাজ কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে বিনে ভাড়ায় ওয়াশিংটন যাওয়ার কাজ বাগিয়ে নিলে? আচ্ছা বাহাদুর ছেলে তো! নিশ্চয়ই তোমার অমন সুন্দর চেহারা ও অত ফর্সা রং দেখে তোমাকে ভারতীয় বলে বুঝতেই পারেনি, সেইজন্যই কাজটা পেয়ে গেলে।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম,—আমি তো প্রথম সাক্ষাতেই লিখে দিয়াছিলাম, "হিন্দু"।

আর একজন আবার বলে উঠলেন—সাবধান বাপু, এখনও তো মেয়েদের খপ্পরে পড়নি। এসব সাদা মেয়েরা অমন সুন্দর চেহারা দেখলে "হাড় খাবে, মাংস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে!"

মিঃ মজুমদার একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন—ওর মত সুন্দর চেহারা অনেক ভারতীয় ছেলেদের আছে। এ হচ্ছে "বাঙ্গালীর কৃতিত্ব, বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর ভরসা।"

হঠাৎ এতবড় একটা সম্মান পেয়ে আমার বেশ একটু অহঙ্কার হলো। অহঙ্কার জিনিষটা মন্দ নয়, যদি তাতে মানুষকে ডুবিয়ে না দেয়।

আলাস্কার পথে

১৪'ই তারিখে "সান্‌ফ্রানসিস্‌কোতে যেয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে চিঠি ছু'খানা দিলাম। তিনি চিঠি পড়ে নানা কথার পর একজন খালাসীকে ডেকে আমাকে চীফ ষ্টুয়ার্ডের কাছে নিয়ে যেতে বললেন। তিনিও একটি চিঠি দিলেন।

চীফ ষ্টুয়ার্ড চিঠিগুলি পড়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল—প্রেসিডেণ্টকে আমি চিনি কিনা?

গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, চিনি।

চীফ ষ্টুয়ার্ড আমাকে একজন কেবিন-বয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—মিষ্টার রায় একজন নূতন লোক। কাজকর্ম সহানুভূতিয় সঙ্গে শিখিয়ে নিও। প্রেসিডেণ্টের চিঠিও তাকে দেখাল।

ভগবানের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করলাম যেন ঝড় বাতাস না হয়। কারণ জাহাজ ছুললেই আমার ভীষণ মাথা ঘোরে ও সি-সিক্‌নেস হয়। কিন্তু চার দিন পরেই ঝড় উঠে আমাকে শয্যাশায়ী করে দিল। মাথা তুলতে পারছিলাম না। চীফ ষ্টুয়ার্ড দেখে বললে—শুয়ে থাক, আমরাই তোমার কাজ চালিয়ে নেব।

পরের দিন ঝড় বন্ধ হয়ে গেল, আমার পীড়া সেরে গেল। আমি উঠে গেলাম। নোম পৌছানো পর্যন্ত আর ঝড় হয় নি।

সিয়াটেল

আমরা সিয়াটেল পৌঁছলাম। এই বন্দরটি ওয়াশিংটন ষ্টেটের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সহর। স্থলের মাঝখানে সমুদ্র এসে যে হ্রদ সৃষ্টি করেছে তার নাম হচ্ছে "প্যাজেট সাউণ্ড"। অতি সুন্দর সুরক্ষিত বন্দর। আমরা এখানে ছু'দিন ছিলাম। জাহাজ ফিরে যাওয়ার পথে

নেমে এই সহরেই থাকব ও পড়াশোনা করব ভেবে খুবই আনন্দ হলো। যত দূর সম্ভব ট্রামে বাসে ঘুরে সহর ও বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম।

সিট্‌কা

সিয়াটেল হতে সিট্‌কা সহর সাতশো মাইল দূরে। পৌঁছতে প্রায় চার দিন লাগল। জাপানে তিনদিকে স্থল ঘেরা 'হ্রদের'-এর মত সমুদ্র দেখে ভেবেছিলাম এরকম সুন্দর দৃশ্য বোধ হয় আর নেই। কিন্তু সিট্‌কা যেতে দুধারে প্রকৃতির যে অপূর্ব সৌন্দর্য দেখলাম, সে রকম দৃশ্য জীবনে আর দেখিনি। সে এক অদ্ভূত বিস্ময়কর দেশ। ভগবানের এই অপূর্ব সৃষ্টির কাছে মাথা আপনা হতেই নুইয়ে আসে। দুধারে গভীর জঙ্গল—আকাশ ছোঁওয়া প্রকাণ্ড গাছগুলি যেন দু'হাত তুলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। তাদের গাঢ় সবুজ মাথার ওপরে সাদা বরফে ঢাকা পাহাড়গুলি রৌদ্রের ঝলকে নানা রংএর মুকুট মাথায় দিয়ে মহান গাম্ভীর্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বড় বরফের টুকরাগুলি নীল জলের ওপরে রাজহাঁসের মত ভেসে বেড়াচ্ছে। নদীর মোহানায় 'স্যালমন' মাছগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এই গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মাঝে মাঝে সামুদ্রিক পাখীদের ডাক পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এই সব জায়গায় আসলে মন এত উদাস হয় যে সংসারের কোলাহলের মাঝে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। এই জন্যই মুনি ঋষিরা পাহাড়ে অরণ্যে ধ্যান ধারণার জায়গা বেছে নিয়ে জীবন কাটান।

আলাস্কা

আলাস্কা যখন রুষদের অধীনে ছিল, তখন সিট্‌কা সহর ছিল তাদের রাজধানী। এখানে সমুদ্রের জল আমাদের দেশের বিলের জলের মত পরিষ্কার। সমুদ্রের জলের নীচে ঝিনুক, মাছ, শেওলা, 'স্পঞ্জ' সব অতি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। জাহাজ ঘাটের একটু দূরেই সেকালের

শাসন কর্তাদের কাঠের তৈরী তিনতলা বাড়ি দুর্গ দেখতে পেলাম। পরের দিন সহর দেখতে বের হলাম। দেখার কিছুই নেই। শুধু পুরানো একটা কাঠের বাড়ীতে রুষদের তৈরী বহু পুরাতন পেতলের থালা বাটী গ্লাস ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস দিয়ে একটা যাদুঘরের মত আছে। হিন্দুরা যেমন চিতার ওপরে মঠ তৈরী করে, এখানে আদিম নিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানরা তেমনি কবরের ওপরে ৪০/৫০ ফুট কাঠের স্তম্ভের ওপর নানা রকম রং-এর জীব জন্তুর মূর্তি খোদাই করে রেখে মৃতের স্মৃতি রক্ষা করে। একে বলে "টোটেম পোল" (Totem Pole)। এই খোদাই মূর্তিগুলিই এদের বংশ-পরিচয়। নবাগত রেড-ইণ্ডিয়ানরা এইগুলি দেখে তাদের পূর্ব-পুরুষদের ইতিহাস খুঁজে বের করে।

স্যাণ্ড-পয়েন্ট

এখান থেকে স্যাণ্ড-পয়েন্টে গেলাম। এটা আলুসিয়ান দ্বীপের প্রধান সহর হলেও সামান্য একটি ছোট্ট গ্রাম। অধিবাসীরা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পাতার ছাউনি দিয়ে ঘর তৈরী করে। স্থলের চেয়ে জলের সঙ্গেই এদের সম্পর্ক বেশী। সমুদ্র হতে এদের খাবার, পোষাক ইত্যাদি জীবন-ধারণের সব রকম জিনিসের যোগাড় হয়। সিন্ধুঘোটকের চামড়ায় নৌকা তৈরী হয়। 'ওলীকেন' নামে একরকম ছোট ও মোটা মাছ শুকিয়ে রাখে। সেগুলিকে দিয়ে মোমবাতীর মত রাত্রে আলোর কাজ চলে। সামুদ্রিক সিংহের মাংসই এদের প্রধান খাদ্য। এমন কি মাঝরাতে শিশুরা কেঁদে উঠলে এই 'সিংহের চর্ব্বি" (Sea-Lion) পল্‌তে করে চুষতে দেওয়া হয়। পথে যেতে মাঝে মাঝে মানুষের কঙ্কাল গাছে ঝুলছে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ এরা অনেক সময় কবর দেওয়ার হাঙ্গামা এড়ানোর জন্য মৃতদেহ গাছে ঝুলিয়ে রাখে। এখানে সাদা ও নীল রংএর শেয়ালগুলি নির্ভয়ে চরে বেড়ায়। এরা সারা বছর 'শিল' ও সমুদ্র সিংহের মাংস-চর্বি খেয়ে দিব্যি

নধর কান্তি হয় এবং শীতকালে শীকারীদের ফাঁদে মারা পড়ে। প্রায় এক মাইল দূরে আমি একটি 'শেয়াল-পালনের' খামার (Farm) দেখতে গেলাম। এখানে হাজার হাজার শেয়ালকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করা হয়। ঠিক সময়ে এদের মেরে চামড়াগুলি কানাডা আমেরিকাতে পাঠানো হয়। সেখানে এই চামড়ায় মেয়েদের কোট, মাফ্‌লার, দস্তানা ইত্যাদি তৈরী করে উচ্চ দরে বিক্রী করা হয়।

সেণ্ট মাইকেল

এই গ্রামটি নদীর মোহানায় একটি দ্বীপ। জাহাজ কোম্পানীর লোকজন অফিসারদের বাড়ী-ঘরগুলিও স্থানীয় অধিবাসীদের কুঁড়ে ঘরের মত। গ্রামের মাঝখানে একটি বড় ঘর আছে। তার নাম হচ্ছে "কাসিমা" অর্থাৎ ক্লাব। স্যাণ্ড-পয়েণ্ট হতে এখানে আসার পথে অনেক সিন্ধু-ঘোটক ও পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য সিল দেখা যায়। বাচ্চা সিলগুলির রং একেবারে কালো, একটা কাদার ঢেলার মত মনে হয়। এখানে যেদিন পৌছলাম সেদিন নিউইয়র্কের একজন যাত্রীর সুটকেস খুঁজে না পাওয়ায় খুব হৈ চৈ সুরু হলো। জাহাজের দ্বিতীয় অফিসার এসে তাঁকে বললেন, আপনি কেবিনে ফিরে যান, সকালবেলার মধ্যেই আপনার সুটকেশ খুঁজে বের করব।
যাত্রিটি চলে যাওয়ার পরে হেসে বললেন—এখানে এখনও অনেক বাকি আছে সকাল হতে! আলাস্কাতে রাত ও দিনের মাঝে অনেক তফাৎ। এখানে রাত প্রায় ন' মাস একটানা থাকে। দিনের আলো পাওয়া যায় মাত্র তিন মাস। যাক্ সেইদিনই সুটকেসটি পাওয়া গেল। সকালবেলার জন্য আর অপেক্ষা করতে হলো না।

নোম

সেণ্ট মাইকেল হতে শেষ বন্দর আলাস্কার রাজধানী নোমে (Nome) এসে পৌছলাম। আমরা "রেইন ডিয়ার"-এর গাড়ীতে চড়ে সহরে গেলাম। আমরা যেমন গো-মাংস খাই না, আলাস্কার

লোকরাও তেমমি রেইন-ডিয়ারের মাংস খায় না। নোম রাজধানী হলেও তার কোনও ধন-সম্পদ দেখলাম না। বিরাট এক খণ্ড জমাট বরফের ওপরে কতকগুলি কুঁড়েঘর মাত্র। সহর হতে একটু দূরে "আরভিল" পাহাড়ের উপরে একটি সুন্দর জায়গা আছে। নাম হচ্ছে "কারসা-গামা"। খুব কাছেই একটি গরম জলের কুণ্ড আছ। চর্ম রোগ সারানোর জন্য নানা দেশ হতে বহু লোক এই কুণ্ডে স্নান করতে আসে। এখানের আদিবাসীদের এস্কিমো বলে। অনেক রেড ইণ্ডিয়ানরাও বহুযুগ হতে এখানে বাস করছে। সকলেই খুব বলিষ্ঠ ও অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারে। আলাস্কাও আশ্চর্য রকমের একটি সুন্দর দেশ। এত নীরব ও নিস্তব্ধ দেশ ছুনিয়ায় বোধহয় আর নেই। একদিকে অগাধ অনন্ত নীল জল ও আর একদিকে সীমাহীন বরফে ঢাকা সাদা ধপধপে জমি ও সারি সারি উঁচু পাহাড়। তার ভেতর দিয়ে জমাট বরফের অনেক নদী অতি ধীরে ধীরে অবিরাম .বয়ে যাছে। এত আস্তে আস্তে যাচ্ছে যে চোখে দেখলেও সেটা বোঝা যায়না। মনে হয় সাদা পাহাড়গুলির মাঝখানে সাদা ফিতে যেন এঁকে বেঁকে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে বিরাট বরফের খণ্ড ভেঙ্গে ভেঙ্গে সমুদ্রে এসে পড়ছে। ওই রকম বরফ ভাঙ্গার শব্দ ও পাখীর ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। ঘড়ির হিসেব মত যখন "আমায় ভুলোনা" (Forget me not) ফুলগুলি ফুটতো, তখন অন্ধকারও হতো না, আকাশে তারার মালাও দেখা যেত না। শুধু স্তিমিত সূর্যের আলো—যাকে বলে 'Twilight'—থাকত। এদের 'শ্লেজ' গাড়ীগুলি কুকুরের দল বরফের ওপর দিয়ে লোকজন জিনিসপত্র সমেত অতি দ্রুত টেনে নিয়ে যায়। এস্কিমোরা এই সব কুকুরদের খুবই যত্ন করে। সারা গ্রীষ্মকালটা এই কুকুরগুলি বসে শুয়ে কাটায় ও শুধু শুধু চেঁচায়। শীত পড়লেই 'শ্লেজ' গাড়ীগুলি বরফের ওপর দিয়ে যাতায়াত সুরু করে। এই কুকুরের দল না থাকলে শীতকালে আলাস্কা দেশটি একেবারেই অচল হয়ে যেত। এরা বাইরে জমাট

বরফের ওপরেই ঘুমায়। খুব ঝড় এলে বরফের ভেতর সুড়ঙ্গ করে আশ্রয় নেয়।

সাদা তিমি মাছ আলাস্কাবাসীদের অতি উপাদেয় খাদ্য। প্রথম সাদা তিমি মাছ শীকার করে ঘরে আনলে আমাদের দেশে যেমন প্রথম জোড়া ইলিশ মাছ সিন্দুর ইত্যাদি দিয়ে ঘরে তোলে, এরাও তেমনি নানা রকম রীতি-নীতি পালন করে। যার ভাগে যেটুকু মাছ পাওয়া যায় বেটাছেলেরা নিজেরাই সেটুকু রান্না করে। ছেলেরা পেটভরে খাওয়ার পর যেটুকু বাঁচে সেটুকুই 'মেয়েরা খেতে পায়। তিনি ছাড়াও এস্কিমোরা সিন্ধু-ঘোটক, সাদা ভাল্লুক, সিল ইত্যাদির মাংস খায়। শীতের সময় কাঁচা মাংস ও চর্বি খুব বেশী খাওয়ার দরকার। নইলে শীতে জমে যেতে হবে। চর্বিতে শরীর গরম রাখে।

আমাদের দেশে যেমন কুমীররা নদীর চরে উঠে বিশ্রাম করে, তেমনি এখানের সিন্ধু-ঘোটক সিলরাও সমুদ্রের বড় বড় বরফের খণ্ডের ওপরে সপরিবারে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা দেয়। সেই সময় এস্কিমোরা তাদের "কিয়াক" নৌকা নিয়ে শীকার করতে বের হয়। কিয়াকের কাঠামটা তিমি মাছের হাড়ে তৈরী ও সিলের চামড়ায় ছাউনী। সাধারণতঃ বল্লম দিয়ে শীকার করা হয়। শীকারের পরে সিলের চামড়া দিয়ে তৈরী দড়ি বেঁধে মরা জন্তুগুলিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফিরে যাওয়ার দিন এল। জাহাজের দ্বিতীয় অফিসার আমাকে বেশ পছন্দ করতেন। একদিন তাঁকেই সব খুলে বললাম যে সিয়াটেলে নেমে যেতে চাই কলেজে পড়াশোনা করার জন্য। তিনি বল্‌লেন যে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করে আমাকে জানাবেন।

সিয়াটেল পৌঁছবার তিন দিন আগে ক্যাপ্টেন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বল্‌লেন—সানফ্রানসিস্‌কো ফেরার পথে 'মাঝখানে জাহাজ ছেড়ে চলে যাবার নিয়ম নেই। তবে যদি তোমার বদলে আর একজন কেবিন-বয় পাই, নিশ্চয়ই তোমাকে সিয়াটেলে নামিয়ে দেব।

অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম। দ্বিতীয় অফিসার সব শুনে বললেন—নিশ্চয়ই একজন কেবিন-বয় পাওয়া যাবে, তোমার কোনও ভাবনা নেই।

সন্ধ্যাবেলা সিয়াটেল পৌঁছলাম। তার পরদিনই ক্যাপ্টেন আমাকে ডেকে বললেন—কেবিন-বয়, পাওয়া গেছে, তুমি যেতে পার।

তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে পরের দিন সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় অফিসারকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মালপত্র নিয়ে নেমে গেলাম।

সিয়াটেল

জেটিতে নেমে জিনিস-পত্র আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীতে রেখে ট্রামে উঠে সহরে গেলাম। মিঃ মজুমদার আমাকে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক মিঃ দাসের ঠিকানা দিয়েছিলেন। দু'একবার জিজ্ঞেস করতেই সেই রাস্তা ও বাড়ী পেলাম। এখন আর আমি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা 'বাংলা-ইংরেজী' বলি না। এতদিন জাহাজে শুধু খাঁটি সাদাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে থেকে আমিও ওদের মতই নাকি সুরে পাকা আমেরিকান ইংরেজী বলতে ও বুঝতে শিখেছি। গায়ের রংটাও এই কয়মাসে খুবই "সাদা" হয়েছে। আমেরিকায় পৌঁছেই একটা ভাল পোষাকও কিনেছিলাম। বাইরে বের হওয়ার সময় সেইটাই পরতাম। তাছাড়া যৌবনের চেহারা ও মনের বল তো আছেই। তার ওপর এদেশে আসা পর্যন্ত সকলের কাছেই এত ভাল ব্যবহার ও প্রশংসা পেয়েছি যে তাতে নিজের মনে বেশ বিশ্বাস হয়েছে যে আমি আর আগের মত অভাগা ও অসহায় নই। জীবনে কোনও মুস্কিল বা বাধা আসলে অনায়াসেই এড়িয়ে যেতে পারব।

মিঃ দাস ঘরেই ছিলেন। আরও কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রও ওই ঘরে ছিলেন। আমার পরিচয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছি শুনে

বললেন জিনিষ পত্র এনে তাঁর বাড়ীতেই থাকতে। এক ঘণ্টার মধ্যেই সুটকেস ইত্যাদি নিয়ে ফিরে এলাম।

তিনি একটি ঘর দেখিয়ে বললেন—এখানে আর একটি ছেলে থাকে, এটা ডবল সীটের ঘর। তুমি এই ঘরেই থাক্‌বে।

আমি বাক্স, সুটকেস খুলে সব জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলাম। সন্ধ্যার মধ্যেই সব ছেলেরা ফিরে আসলেন ও সকলের সঙ্গে পরিচয় হলো। কাজ করে আমার খাওয়া, কলেজে পড়া সব চালাতে হবে শুনে সব ছেলেরাই আমাকে ইউনিভার্সিটির Y.M.C.A-এর সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। পরের দিন সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমার নাম-ঠিকানা নিয়ে বললেন যে পরের দিন সকাল ৮'টায় যেন একবার খোঁজ নিয়ে যাই। মহা উৎসাহে বাড়ী ফিরে মিঃ দাসকে বললাম। খুবই আনন্দ হলো এত সহজে এত শিগ্‌গির কাজ পাব ভেবে।

তাঁর কথা মত সকাল ৮টায় Y.M.C.A-তে যেতেই সেক্রেটারী বললেন—বাড়ী ঘর পরিষ্কার করার কাজ আছে, তুমি যাবে? তখুনি রাজি হওয়ায় সেক্রেটারী এক বাড়ীওয়ালাকে ফোন করে জানালেন—তোমার কাজ করার জন্য একজন 'হিন্দু' ছাত্রকে পাঠাচ্ছি।

'হিন্দু' ছাত্র বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাকে যেন নিগ্রো ভেবে ফেরৎ না পাঠায়। আমেরিকাতে নিগ্রো-সমস্যা এক ভীষণ ব্যাপার। অনেকেই নিগ্রোদের কাজ দিতে চায় না। বাড়ীওয়ালী 'হিন্দু' ছাত্র শুনে আপত্তি করল না। সেক্রেটারী ঠিকানা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি যেতে বললেন। যেখানে যেতেই বাড়ীওয়ালী কি কি কাজ করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে ওপর তলায় নিয়ে একটি ঘর দেখিয়ে বললেন—এখান হতে সুরু কর। আটটি ঘর পরিষ্কার করতে প্রায় ছ' ঘণ্টা লাগল।

মজুরী নিয়ে মহা আনন্দে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরলাম। আমেরিকাতে কাজ করে খুবই সুবিধা ও সুখ আছে। যেমন ভদ্র

ব্যবহার করে, তেমনি আবার মজুরীর ওপরে কিছু অতিরিক্ত টাকাও দেয় (Tips)। মজুরীও অনেক বেশী দেয়। কোনও রকম দর-দস্তুরী করে না। আবার চাকরের কাজ করলেও ছোট জাত ভেবে তাচ্ছিল্য করে না। যাকে বলে "Dignity of Labour"। দুপুরে হালকা লাঞ্চও দেয়। যাক্, এই রকম খুচ্‌রো কাজ প্রায় রোজই পেতাম ও প্রাণপণে পরিষ্কার ভাবে কাজ করতাম, কেউ যেন খুঁত ধরতে না পারে। আমার খাওয়ার ও থাকার খরচ এতেই বেশ চলে যাচ্ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সময় হয়ে এল। রেজিষ্ট্রার আমাকে 'হাই-স্কুলে' যে যে বিষয় পড়েছি সেগুলি মুখে মুখে মোটামুটি পরীক্ষা করে বললেন—আমি Science-এ ভীষণ কাঁচা। আমাকে স্পেশাল ছাত্র হিসাবে নেবেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্ত বিষয়গুলিই ভাল করে শিখে অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে ক্লাসে যোগ দিতে হবে। পেছনে পড়ে থাকলে চলবে না।

আমেরিকায় প্রফেসাররা ছাত্রদের সব বিষয়েই এত যত্ন নেন (personal care) যে সেটা না দেখলে ধারণা করা অসম্ভব। আমি একজন দরিদ্র ভারতীয় ছাত্র, মাত্র হাইস্কুল পর্যন্ত পড়েছি অথচ আমার প্রফেসর কত যত্ন ও দরদ দিয়ে আমাকে লেখাপড়ায় সফল হওয়ার জন্য সব রকমে সাহায্য করলেন। চিঠি দিয়ে হাইস্কুলের এক শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তিনি যেন আলাদাভাবে আমাকে সব বিষয়গুলি পড়িয়ে তৈরী করিয়ে দেন। সপ্তাহে তিনদিন যখন আমার ক্লাশে পড়া থাকত না তখন তাঁর কাছে যেয়ে পড়তাম।

Y. M. C. A.-এর সেক্রেটারীর সাহায্যে 'ফ্রেটারনিটি ক্লাবে' একটা কাজ পেলাম। এটা হচ্ছে কলেজের একটা অ্যাসোসিয়েশন। রোজ সকালে দুপুরে ও সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা করে টেবিলে খাবার পরিবেশন করতাম, তার বদলে আমাকে সমস্ত খাওয়া ও কিছু হাত খরচাও দিত। আমার সব বিষয়েই খুব সুবিধা হলো। প্রতিদিন রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে খেতে

যেমন সময় নষ্ট হতো, তেমনি টাকাও খরচ হতো। এখানে খাবার খুবই ভাল ও প্রচুর দিত। আমি চিরদিনই সল্পাহারী, তার ওপর আমেরিকানরা পরিমাণে এত বেশী খায় যে আমার পক্ষে ওদের একদিনের খাবার সাত দিনেও শেষ করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আমি 'হিন্দু ছাত্র', কাজ করে কলেজ পড়ছি ও আর সব খরচ চালাচ্ছি শুনে সকলেই খুব ভাল বাসত ও নানাভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করত। রাঁধুনীরা আমার জন্ম সব চেয়ে ভাল খাবার রেখে দিত ও বাইরের অতিথিরা অনেক টাকা বখশিস (Tips) দিত। কিন্তু বেশী দিন এ সুখ টিকল না!

সেদিন ছিল শনিবারের সন্ধ্যা। ছাত্রেরা সকলেই ভাল পোষাক পরে কোথায় যেন নাচতে যাবে। মহা উৎসাহে সকলে খেতে বসেছে। আমি একটি করে সুপ-প্লেট নিয়ে পরিবেশন করছি। মেট্রণ রাঁধুনী ঝি সকলেই সাহায্য করছিল।

একজন ওয়েটার বলল—তুমি একটি একটি করে প্লেট নিয়ে পরিবেশন করলে তো রাত ভোর হয়ে যাবে, হুটো প্লেট এক সঙ্গে নিয়ে যাও।

আমি ভয়ে ভয়ে হু'হাতে হুটো সুপ-প্লেট নিয়ে পরিবেশন করতে গেলাম। যখন ডান হাতের সুপ প্লেটটা একটি ছেলেকে দিতে গেলাম তখন পাশের ছেলেটীর গায়ে বাঁ হাতের প্লেটটা হেলে আগুণের মত গরম সুপ পড়ে গেল। ছেলেটী লাফ দিয়ে উঠে আমার দিকে একবার জলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। আমি যে কি অপ্রস্তুত সেটা লিখে আর কি বোঝাব?

কিছুক্ষণ পরে আমি ঐ ছেলেটির ঘরে গেলাম। ছেলেটির নাচে যাওয়ার ভাল ইভিনিং-স্যুট নষ্ট হওয়াতে সারা শনিবারের সন্ধ্যাটাই নষ্ট হয়ে গেল, বাইরে যাওয়া আর হলোনা।

লজ্জিতভাবে বললাম—আমি খুবই হুঃখিত তোমার পোষাক ও শনিবারের সন্ধ্যাটা নষ্ট হওয়ার জন্য।

ছেলেটীও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল—তোমার হুঃখ হওয়াই উচিত।

আমি সে রাত্রে আর কিছুই খেতে পারলাম না, গলা দিয়ে যেন খাবার নাম ছিল না। সকলেরই যেন থমথমে ভাব। পরের দিন সকালে আমার খাবারের পাশে এক টুকরা কাগজে লেখা ছিল—"তোমার কাজের আর দরকার নেই।" কোনও মতে কিছু খেয়ে বাড়ী চলে গেলাম। ভীষণ মন খারাপ।

আবার Y. M. C. A.-এর সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব বললাম। তিনি তো শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—ভেব না, আমি অনেক কাজের যোগাড় করে দেব।

তিন-চার দিন পরেই ডেকে বললেন—তিনটী বাড়ীতে বারান্দা ও সামনের রাস্তার বরফ উঠিয়ে পরিষ্কার করতে হবে রোজ ভোরে। সব বাড়ীগুলিই খুবই কাছে ও আমার কলেজের পড়ার একটুও ক্ষতি হবে না।

মহা উৎসাহে পরের দিনই কাজে লেগে গেলাম ও গ্রীষ্মের বন্ধ পর্যন্ত ঐ সব বাড়ীতে নানা রকম কাজ করলাম। তাছাড়া প্রতি শনিবারে খুচরো কাজ করেও অনেক ডলার উপার্জন করতাম। সকালে বাড়ীতেই নিজে "ব্রেকফাষ্ট" তৈরী করে খেয়ে কাজে ও কলেজে যেতাম। দুপুরে ও রাত্রে রেষ্টুরেণ্টে খেতাম। টাকার তো তখন মোটেই অভাব ছিল না।

কলেজের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। ভাল নম্বর না পেলেও সব বিষয়েই পাশ করেছিলাম। শুধু বোটানিতে খুব ভাল করেছিলাম, একশোর মধ্যে বিরানব্বই মার্কস পেয়েছিলাম।

মিঃ দাস আমাদের সব বাঙ্গালী ছাত্রদের এক সঙ্গে ফটো উঠিয়ে সকলের সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখে কলকাতার মাসিক পত্রিকা "প্রবাসীতে" পাঠিয়ে দিলেন। সে যুগে অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী ছেলেরাই আমেরিকায় আসত। বেশীরভাগ ছেলেরাই বিলেত যেত। তবে সেখানে বড় লোকের ছেলেরাই যেত, যাদের আমাদের মত খেটে খেতে হতো না।

গরমের ছুটীতেই সব ছেলেরাই নানা জায়গায় নানা রকম কাজে চলে গেল। আমাদের মত ছাত্ররা কাজ করে সেই টাকায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ার খরচ চালায়। তারা সকলেই গ্রীষ্মের ছুটীতে অনেক ডলার উপার্জন করে। সেই টাকাতেই প্রায় সারা বছরের কলেজের ফি ইত্যাদি দেয়। খাওয়া থাকা, পোষাকের খরচ কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে চালিয়ে নেয়। যেমন আমি করছিলাম। আমি গরমের ছুটীতে বাইরে কাজের জন্য বিজ্ঞাপন দেখে দেখে নানা জায়গায় চিঠি লিখেছিলাম। অরিগণ ষ্টেটের পোর্টল্যাণ্ড হতে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে অ্যাষ্টেরিয়াতে একটি প্রকাণ্ড কাঠের কারখানা আছে। সেখানে অনেক শিখ কাজ করেন। একজন মিঃ সিং আমার চিঠির উত্তরে সেখানে আসতে লিখলেন।

ট্রেনে পোর্টল্যাণ্ড রওনা হলাম। রাত দশটার সময় পৌঁছে ষ্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানলাম পরের দিন সকাল সাতটায় আমি যেখানে যাব সেখানকার ট্রেন পাওয়া যাবে। কোথায় যাই, রাতটা কোথায় কাটাই? সবই আমার অজানা।

অনেক ভেবে চিন্তে হোটেলে যাওয়াই ঠিক করলাম। ষ্টেশনের কাছাকাছি যে সব ছোট ছোট হোটেল ছিল, সেই সব হোটেলে খোঁজ নিতে লাগলাম—কত অল্প টাকায় রাতটা কাটানো যায়। খুব সস্তার হোটেল নোংরা হবে ভেবে মাঝারী দামের হোটেলে ঢুকলাম।

পোর্টারকে জিজ্ঞেস করলাম—ঘর খালি আছে কি না?

সে বলল—উপরে যাও।

দোতালায় যেয়ে কলিং বেল টিপতেই একটি মেয়ে এসে একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটি বেশ বড় ও বিছানাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খুশী হয়ে ধন্যবাদ দিয়ে দরজা বন্ধ করে কোট, জুতো, মোজা খুলছি, এমন সময় দরজায় কে যেন নক করল। দরজা খুলে দেখি বিরাট দেহ 'ল্যাণ্ডলেডী' ও তার পিছনে অল্পবয়সের কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের

পরনে শুধু লম্বা অতি পাতলা 'ড্রেসিং গাউন' কোনও মতে জড়ানো। একজন মেড একটা ট্রেতে নানা রকম পানীয় এনে টেবিলে রাখল।

মোটা ল্যাণ্ডলেডি আমাকে বলল,—তোমার যে মেয়েটিকে ইচ্ছা বেছে নাও।"

আমি তো হতভম্ব। তাকে বললাম—তুমি এদের চলে যেতে বল। আমি সব বুঝিয়ে বলছি।

মেয়েগুলি চলে যাওয়ার পর বাড়ওয়ালীকে বললাম—আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিন্দু ছাত্র'। এইমাত্র ট্রেন থেকে নেমেছি এই সহরে। কাকেও চিনি না। কাজেই রাতটা কাটাব ভেবে এখানে উঠেছি। এটা কি ধরণের হোটেল বুঝতে পারিনি। ল্যাণ্ডলেডি ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলল—'এত রাতে তোমাকে এই অজানা সহরে বের করে দিতে পারিনা। তবে চার ডলার দিতে হবে ভাড়া হিসেবে।

তখুনি তাকে চার ডলার দিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। সারারাত ভয়ে ঘুম হলো না লোকজন আসা যাওয়ার ও হৈ চৈ শব্দে। ভোর হতেই সুটকেসটা নিয়ে ষ্টেশনে চলে গেলাম। সেখানে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাতটার ট্রেনে অ্যাস্টোরিয়াতে মাত্র দুঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

অ্যাষ্টোরিয়া

মিঃ সিং-এর বাড়ী খুঁজে বের করে সেখানে যেয়ে শুনলাম তিনি ও অন্য সকলেই কাঠের কারখানায় চলে গেছেন। বাড়ীতে কেউ নেই। আমি তখন কাঠের কারখানায় যেয়ে মিঃ সিংকে খুঁজে বের করলাম। আমাকে নিয়ে তিনি তখুনি বাড়ী ফিরে এলেন। নিজের হাতে কফি চাপাটী তরকারী এনে খেতে দিয়ে বললেন—তুমি খেয়ে আমার ঘরে বিশ্রাম কর। আমি বারটার সময় কাজ থেকে ফিরে এসে সব শুনব।

ঠিক বারটার সময় প্রায় ২৩।২৪ জন পাঞ্জাবী শিখ সঙ্গে ফিরে এলেন। মিঃ সিং ঐ কাঠের কারখানার একজন ফোরম্যান। আর সব শিখরা তাঁর অধীনে কাজ করেন। এরা সাধারণ মজুর। সকলের চেহারাই বিরাট লম্বা চওড়া, মুখ ভরা দাড়ি, মাথায় পাগড়ী। যেমন খাটতে পারে, তেমনি মজুরী পায়। অসাধারণ শক্তিশালী সব, যাকে বলে 'অসুরের মত'। আমি তো তাদের কাছে অতি ক্ষুদ্র এক 'পোকাটি'র মত, আমাকে ওরা একটি আঙ্গুল দিয়ে তুলে ফেলতে পারে। পরের দিন মিঃ সিং আমাকে তাদের আমেরিকান ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গেলেন।

তিনি আমাকে দেখে বললেন—তুমি এই রকম কঠিন কাজ করতে পারবে ?

আমি বললাম—কেন পারব না ?

আমার মাংসপেশী টিপে বলললেন—ঐ সব শিখরা যে সব কাজ করছে, তা খুবই কঠিন ও অত্যন্ত দৈহিক শক্তির প্রয়োজন। তবে তুমি কলেজের ছাত্র তোমাকে হালকা কাজ—যেমন হিসেব পত্র রাখা—সেই রকম কাজ দেব।

আমি এইখানে তু'মাস কাজ করে কয়েক শত ডলার রোজগার করে কলেজে ফিরে গেলাম। আগেই বলেছি আমেরিকায় যে কোনও কাজেই খুব ভাল মাইনে দেয়। তার উপর আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিন্দু ছাত্র'—আমাকে মাইনে ছাড়াও অনেক 'টিপস' দিল আমার কাজে খুসী হয়ে। মিঃ সিঃ আমাকে অত্যন্ত যত্ন করতেন ও নিজের ছোট ভায়ের মত স্নেহ করতেন। সকলকে বলে দিয়েছিলেন আমাকে যেন সব রকম সাহায্য করে। মিঃ সিং দেশ হতে ম্যাট্রিক পাশ করে এখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে এক বিপ্লবী দলে যোগ দেন। এই দলের নাম গদর পার্টি ছিল। তিনি ছিলেন ওর সেক্রেটারী। আমিও তাঁর কথা ও আলোচনা শুনে এই পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম।

গদর পার্টি

ভারত হতে ইংরেজদের মেরে তাড়িয়ে দিয়ে দেশে স্বাধীন করব—এই ছিল গদর পার্টির উদ্দেশ্য। এই পার্টির সভ্যরা নিজেদের এত পরিশ্রমের ও কষ্টের টাকার একটা বড় অংশ ভারতে পাঠাতেন স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য। এই টাকা দিয়ে আমাদের দেশে বন্দুক, পিস্তল রিভলবার ইত্যাদি কেনা হতো। আমেরিকা ও বিদেশ হতেও এই সব অস্ত্র-শস্ত্র অতি গোপনে আমাদের দেশে পাঠানো হতো। মিঃ সিং অনেক টাকা রোজগার করতেন, কিন্তু নিজের সামান্য খরচ ছাড়া প্রত্যেকটি টাকা গদর পার্টিতে দিতেন। তিনি অতি সাধারণ ভাবে মজুরদের সাথে থাকতেন ও খেতেন।

চলে আসার সময় আমাকে বললেন—তুমি উচ্চ শিক্ষার জন্য এদেশে এসেছ, নিশ্চয়ই খুব 'বড়' হয়ে দেশে ফিরবে। কিন্তু যত 'বড়ই' হওনা কেন ছুঃখিনী ভারতমাতাকে ভুলো না। যেমন করেই হোক—দেশকে স্বাধীন করতেই হবে। এই যেন তোমার জীবনের সাধনা হয়।

অনেক বছর পরে দেশে ফিরে আসার পর একদিন খবরের কাগজে পড়লাম যে এই গদর পার্টির সভ্যরাই "কোমাগাটামারু" জাহাজে অনেক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দেশে এসেছিলেন। মিঃ সিংকে বন্দী করে পাঞ্জাব নিয়ে যাওয়া হয় ও সেখানে বিচার করে তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়। আমাকেও অনেক মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল যখন I. F. S. পরীক্ষার জন্য বিলেতে ইণ্টারভিউ দিতে গিয়াছিলাম। যাক্, সে সব কথা পরে লিখব।

গান্ধীজি, বীর সাভারকার, চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, জহরলাল, সুভাষ বোস প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত নেতাদের মতই মিঃ সিং একজন মহান স্বার্থত্যাগী দেশপ্রেমিক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তাঁরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে উজাড় করে দিয়েছিলেন

তাঁদের অগাধ ধন দৌলত বিদ্যা বুদ্ধি আর এই গরীব মিঃ সিং দিয়েছিলেন তাঁর সর্ব্বস্ব। শেষে ফাঁসীকাঠে জীবনের আহুতি। জানি না আমাদের "স্বাধীনতার ইতিহাসে" এই অজানা অচেনা সর্বত্যাগী মিঃ সিং-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে আর সব শহিদদের নামের সঙ্গে লেখা থাকবে কিনা ?

গ্রীষ্মের ছুটির পর ফিরে এসে, কলেজে যোগ দিলাম। পড়াশুনা, কাজকর্ম ভাল ভাবেই চলতে লাগল। একদিন লাইব্রেরীতে একজন পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় পড়তেন। বাড়ী মেক্সিকোতে, খুব ধনী লোক।

আমি "ইণ্ডিয়ান" বল্‌তেই চমকে উঠলেন। বলল—মায়া ইণ্ডিয়ান ? বুঝিয়ে বল্‌তে চেষ্টা করলাম,—আমি মায়া ইণ্ডিয়ান নই, হিন্দু ইণ্ডিয়ান।

আমাদের দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হলো। প্রায়ই একসঙ্গে বাইরে খেতাম ও আড্ডা দিতাম। এঁর সঙ্গে রাজনীতি ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হতো। ঐ বন্ধুটি প্রায়ই বলতেন,—তোমাদের মতই আমাদের অবস্থা আগে ছিল, যখন আমরা স্পেনের অধীনে ছিলাম।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম—কেন আমাকে "মায়া-ইণ্ডিয়ান" ভেবেছিলেন ?

উত্তর দিলেন—ওদের দেশে এক অতি প্রাচীন ইণ্ডিয়ান জাতির বাসিন্দা আছে। ওরা নিজেদের মায়া-ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় দেয় ও অনেকটা আমার চেহারার মতো। তাদের চাল-চলন, সাজ-পোষাক, রীতি-নীতির কথা অনেক বললেন। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যেন আমার নিজের লোকদের কথা শুনছি। মনে মনে ভীষণ কৌতূহল হলো নিজের চোখে এই মায়া-ইণ্ডিয়ানদের দেখবার জন্য।

বড়দিনের ছুটির এক সপ্তাহ আগে আমার বন্ধুটি বললেন যে এই ছুটিটা যদি মেক্সিকোতে তাঁর বাড়ীতে কাটাই, তবে তাঁরা সকলেই খুব খুসী হবেন।

আমি বললাম—তুমি আমার বন্ধু, কিন্তু তোমার পরিবারের আর সকলে আমাকে কিভাবে দেখবেন সেটা কি ভেবে দেখেছ? তাছাড়া এতদূরের পথ, যেতে আসতেও অনেক খরচ। আর আমি তো তোমার মত বড়লোক নই।

তিনি বললেন—আমি তোমার কথা আমার মা বাবাকে প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই লিখি। মাও লিখেছেন যে বড়দিনের ছুটিতে যদি তাঁদের সঙ্গে কাটাই তবে সকলেই খুব সুখী হবেন। তাছাড়া আমার মা বাবা ভাই বোনরা কেউ "হিন্দু-ইণ্ডিয়ান" দেখেন নি। কাজেই তাঁরাও খুব উৎসুক হয়ে আছেন তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। ইণ্ডিয়াতে তোমাদের দেখতে গেলে অনেক অনেক টাকা খরচ হবে। তুমি মেক্সিকোতে আস্‌লে সব বিষয়েই সুবিধা হবে। তুমি আমাদের প্রধান পর্ব "X-mas"-এর অতিথি। খরচপত্রের কথা ভাবতে হবে না।

আমি তো মহা খুসী। একলা একলা বড়দিনের ছুটিও কাটাতে হবে না, আবার বিনে খরচায় মেক্সিকো দেশটিও দেখা হবে। আমাদের দেশের দুর্গাপূজার বন্ধের মতো সকলেই প্রায় আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে ছুটি কাটাতে যায়। অমাদের মতো যারা অভাগা, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তাদের বড়ই দুঃখ ও একলা মনে হয়। বন্ধুকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম তাঁর নিমন্ত্রণের জন্য। আরও বললাম—তোমাকে কিন্তু আমাকে তোমাদের দেশের মায়া-ইণ্ডিয়ানদের দেখাতে হবে।

উত্তরে বলল যে তাদের "রিজার্ভ" বন্ধুর সহরের বর্ডারের কাছেই। কাজেই কোনও মুস্কিল হবে না।

মেক্সিকো

এসব দেশে বড়দিনে সকলেই সকলকে উপহার দেয় আমাদের পূজোর মতই। বড় দিনটা বিনা খরচায় বন্ধুর পরিবারের সঙ্গে কাটাব,

কাজেই অনেক ঘুরে ঘুরে ও অনেক ভেবে চিন্তে প্রত্যেকের জন্যই আমার সাধ্যমত বেশ দামী উপহার কিনে বাক্সে গুছিয়ে রাখলাম।

সময়মত বন্ধুর সঙ্গে তার বাড়ীতে পৌঁছালাম। রাজপ্রাসাদের মত বিরাট বাড়ী—বাগান, টেনিস-কোর্ট, গলফ-কোর্স সুইমিং-পুল সবই আছে। বন্ধুর মা ভাই বোনরা কেউ ইংরেজী জানে না। শুধু তাঁর বাবা একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলেন। পরিবারের সকলেই আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য সব সময়েই দৃষ্টি রাখতেন।

বড়দিনের উৎসবের পরে আমরা দুই বন্ধু তিন-চার দিনের জন্য "মায়া-ইণ্ডিয়ানদের রির্জাভে" গেলাম। অতি বিস্তীর্ণ জায়গা, যেন আর একটি ছোট বাংলাদেশ। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের চেহারা চাল-চলন বিভিন্ন ধরণের। কোনও জায়গায় মেয়েরা ঠিক বাঙ্গালী মেয়েদের মত মাথায় কাপড় দিয়ে ছেলেমেয়ে কাঁখে করে যাচ্ছে। আবার কোন জায়গায় ঠিক নেপালীদের পোষাক, বাচ্চাদের পিঠে বেঁধে চলেছে। আমাদের দেশের মতো কাঠের ' চাকী. বেলুনে" চাপাটী তৈরী করছে, শিল-নোড়ায় মশলা বাটছে, যাতায় শস্য পিষছে। এদের মাটীর হাঁড়ি কলসী দেখতে ঠিক আমাদের দেশের হাঁড়ি কলসীর মতোই। পূজো পার্বণে মন্দিরে পূজোর জায়গায় নানা রং-এর লতা পাতা ফুল পশু পাখী আঁকে, যাকে আমরা বলি আল্পনা। ঢোল বাঁশীও আছে। চরকায় সূতো কেটে সুন্দর সুন্দর রং-এর কাপড় বোনে।

একটা ' টোটেম" (সমাধি) দেখে একজন বুড়ো মায়া-ইণ্ডিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম—কি লেখা আছে সমাধিতে ?

উত্তর দিল—আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ইতিহাস।

জানতে চাইলাম তাদের পূর্ব-পুরুষদের কথা। উত্তরে বলল সে অনেক কথা, কেমন করে বহু বহু শতাব্দী আগে অনেক সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসেছিল, সেই সব কাহিনী। তাদের ভাষা না জানাতে আমার খুবই অসুবিধা হয়েছিল। বন্ধুটাই দোভাষীর কাজ করছিলেন।

তিনি আবার অতি গোঁড়া খৃষ্টান। আমি প্রাণ খুলে তাদের সঙ্গে কথার আদান-প্রদান করতে পারলাম না।

একদিন আমাদের যাওয়ার রাস্তায় এক গ্রামে কি যেন একটা উৎসব হচ্ছিল। সেখানে যেয়ে দেখি প্রকাণ্ড পেট, মানুষের মত হাত-পা, কিন্তু মাথাটা হাতীর এমনি ধরণের এক মূর্তিকে পূজো করছে।

বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম—এটা কি ?

মহা অবজ্ঞার সঙ্গে বলল—এটা হচ্ছে এই অসভ্যদের এক ভগবান। এ ছাড়াও এদের বৃষ্টির, আগুনের আরও অনেক ভগবান আছে। যত সব অদ্ভুত বিশ্বাস !

আমি তো এই সুদূর মেক্সিকো দেশে আমাদের হিন্দুদের ভগবানের মতো গণেশ বরুণ শিবলিঙ্গ ইত্যাদি দেখে অবাক। বন্ধু খুব গর্বের সঙ্গে বললেন কেমন করে স্পেনের পাদরীরা এই পৌত্তলিকতা ধ্বংস করে এখানে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর মুখে সুসভ্য পাদরীদের ধ্বংস লীলার যেসব কাহিনী শুনলাম, তাতে মনে হলো—'নাদির শা' এদের তুলনায় খুবই ভদ্র ও দয়ালু ছিলেন ! আমি অবশ্য এই নিয়ে আর তর্ক করলাম না বন্ধুর সঙ্গে। কারণ তাঁর বাড়ীতেই আমি অতিথি হয়ে আছি, কি দরকার মন কষাকষি করে ? তাছাড়া জীবনে আর কোনও দিন মেক্সিকোতে আসব না, আর আমার যুক্তি-তর্ক দিয়ে গোড়া খৃষ্টানের ভিত্তিও ভেঙ্গে দিতে পারব না। কাজেই চুপ করে গেলাম।

গ্রামবাসীদের কিসের উৎসব হচ্ছে জিজ্ঞেস করাতে বলল—'বিয়ে'।

—কখন হবে ? উত্তর দিল—'পূণ-লগন' লাগলে বিয়ে হবে।

এই বিদেশে আমাদের ভাষার 'পূণ-লগন' কথাটী শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ যে আমাদের দেশেরই নিয়ম-কানুন, পূজা-আর্চা, আমাদেরই ভাষা। খৃষ্টানের বিয়েতে "পূণ-লগন" দরকার হয় না। হিন্দুদের বিয়েতেই এই নিয়ম।

দুপুরে একটী গাছের নীচে, বসে খেয়ে আবার দু-বন্ধুতে চলতে আরম্ভ করলাম। তিন-চার মাইল আসার পর একটা মাঠের মাঝখানে বড় একটা কাঠের স্তম্ভের সঙ্গে কয়েকটী রঙ্গীন দড়ি ঝুলতে দেখলাম। ওটা কি জিজ্ঞেস করাতে বন্ধু বললেন,—এই হিদেন-ইণ্ডিয়ানরা বছরে একটী নির্দিষ্ট দিনে এই সব দড়ি ধরে ঝুলে নিজেদের নানাভাবে কষ্ট দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে।

মনে মনে ভাবলাম—এতো ঠিক আমাদের দেশের "চড়ক পূজো"।

রামায়ণে বর্ণিত পাতাল বোধহয় সত্যিই। এই সেই মহী-রাবণের পাতালপুরী। এই মায়া-ইণ্ডিয়ানদের পূর্ব-পুরুষরাই ভারতের নানা দেশ হতে এসে হাজার হাজার বছর ধরে এই পাতাল-দেশে বাস করছে। এখনও এদের চাল-চলন বেশ-বাস পূজো বিয়ে ঠিক আমাদের দেশের মতোই। 'অতীত' এখনও বর্তমানেই আছে।

ছুটী ফুরিয়ে গেল আমরা দুই বন্ধুও কলেজে ফিরে গেলাম। আলাস্কা ও মেক্সিকো হতে ফেরার পর আমার আর রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিষয়ের ছবি (ফিল্ম) দেখতে ভাল লাগতো না। কারণ সে সব ছবিতে রেড-ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধে হারিয়ে আমেরিকানরা কেবল নিজেদের বীরত্ব ও মহত্ত্ব দেখাত। বেচারীদের দোষ নিজেদের দেশকে খুবই ভাল বাসতো ও তাদের ধর্ম রীতি-নীতি কিছুতেই ত্যাগ করতে চাইত না। কাজেই তাদের বুনো পশুদের মত তাড়িয়ে মেরে জোর জবরদস্তি করে সভ্য করত। দুনিয়ার সামনে রেড-ইণ্ডিয়ানদের অতি খারাপ ও বর্বর বলে প্রচার করা হতো যেমন, "সাদাদের" চুরি করে তাদের দেবতার কাছে বলি দেওয়া, ঘর বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে বিষাক্ত তীর ধনুক দিয়ে মেরে ফেলা ইত্যাদি অনেক কিছুই।

বিখ্যাত কবি লংফেলো তাঁর "Hiwatha, The Laughing water" মহাকাব্যে রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিষয়ে অনেক ভাল ভাল কথা লিখেছেন, কিন্তু আমাদের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন তাঁর অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধে' ইন্দ্রজিৎ রাবণ প্রভৃতির চরিত্রের যে

সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন, কবি লংফেলো ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে সে রকম কিছুই করেন নি।

কলেজে ফিরে আসার পর বন্ধুকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতাম রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিষয়ে। ঐ সব ফিল্ম দেখতে যাচ্ছে জানলে বলতাম —তোমার মত খাঁটি খৃষ্টানের ঐ রকম ছবি—রেড-ইণ্ডিয়ানদের ধ্বংস করে খৃষ্টান করা—দেখলে নিশ্চয়ই পূণ্য হবে!

আমি লাইব্রেরীতে রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিষয়ে বই পেলেই খুব মন দিয়ে পড়তাম। কেমন যেন একটা ঝোঁক হয়েছিল ওদের সম্বন্ধে ভাল করে জানবার জন্য। বিখ্যাত গবেষণাকারী মিঃ ডেকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিষয়ে লিখেছিলেন যে স্পেনদেশীয়রা যাদের বর্বর হিদেন বলে ধ্বংস করেছে, সেই রেড-ইণ্ডিয়ানদের সভ্যতা স্পেনের সভ্যতার চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। আমার বন্ধুকে ওই লেখা দেখালাম। সে বললে যে ও হচ্ছে নানা মুনির নানা মত! যাহোক, আমাদের বন্ধুত্ব কিন্তু কোনও দিন একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। যতদিন সেখানে ছিলাম দুজনে সব সময়ে এক সঙ্গে কাটাতাম।

আমেরিকার কলেজের টার্ম হচ্ছে চার মাস করে। আট মাসে বছর শেষ হয় অর্থাৎ চার মাস ছুটি থাকে। টার্ম শেষ হলো, গ্রীষ্ম এল। ছুটির মধ্যে আবার কাজের খোঁজে বাইরে যেতে হবে। এদেশে গরমের সময় বহু কাজ থাকে ও অনেক লোকের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য যাদের লোকের দরকার তারা ছুটির দু' তিন মাস আগেই কলেজে কলেজে লিখতে থাকে কতজন ছাত্রের দরকার, কোথায় কি কি কাজ করতে হবে, কত দিনের জন্য ইত্যাদি। কারণ সাধারণত ছাত্রদের দিয়ে ভাল কাজ পাওয়া যায় ও ছাত্রদেরও খুব উপকার হয়। এই চার মাস ছুটির মধ্যে কাজ করে সেই টাকায় সারা বছরের পড়ার খরচ চলে। কলেজের এমপ্লয়মেন্ট বিভাগ হতে উপযুক্ত ছেলেদের বেছে বিভিন্ন কাজে পাঠানো হয়। Y. M. C. A-এর সেক্রেটারী একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ছুটীতে আমি "ক্যালিফোর্নিয়াতে" ফল তোলার

কাজে যেতে রাজী কিনা। আমি তো মহাউৎসাহে রাজী হলাম, যাকে বলে 'রথ দেখা আর কলা বেচা' দুইই হবে। নতুন দেশ ক্যালিফোর্নিয়া দেখা হবে, টাকাও রোজগার হবে। ফল তোলার কাজ বেশ কঠিন, কিন্তু খুব ভাল মাইনে দেয়।

সেক্রেটারী বললেন আমাকে সেখানে "স্যান্‌টো-ভ্যালীতে" যেতে হবে। ঐ জায়গাতে আমেরিকার সব চেয়ে সেরা নানারকম ফল জন্মে।

ক্যালিফোর্নিয়া

কয়েকদিন পরেই সেখানে পৌঁছে ফলের বাগানের মালিকের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি দুপুরে আমাকে "লাঞ্চ" খাইয়ে মোটরে প্রায় ৩০।৩৫ মাইল দূরে তাঁর নিজের এক বিরাট ফলের বাগানের প্রধান মালীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এক।জে সাপ্তাহিক বা দিন হিসাবে কোনও মাইনে নেই। যে যত ফল তুলতে পারবে সেই অনুযায়ী মজুরী পাবে। আমরা প্রায় বিশ-পঁচিশজন ফল তুলতাম। তার ভেতরে একজন ইটালীয়ান, তার স্ত্রী ও একটি মেয়েও ছিল। তারা খুব সামান্যই ইংরেজী জানত। একেবারে খাঁটি আমেরিকানদের দলে না থেকে আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ফল তুলত। আস্তে আস্তে আমরা চারজনে এক সঙ্গে সব সময়ে কাজ করতে সুরু করলাম ও বেশ বন্ধুত্ব হলো, যেন একই পরিবারের সবাই। সারাদিন নীচু হয়ে ফল তুলতে খুবই কষ্ট হতো, যাকে বলে পিঠভাঙ্গা (Back breaking) কাজ। কিন্তু আগেই বলেছি এতে অনেক টাকা রোজগার হয়। একদিন ওই ইটালিয়ান পরিবার আমাকে নেমতন্ন করে ডিনার খাওয়াল। প্রায় রোজই তাদের লাঞ্চের ভাগ দিত। ইটালিয়ানদের রান্না আমার খুবই ভাল লাগত। অনেকগুলি খাবার ঠিক আমাদের দেশের রান্নার মতো। আমিও আমার সাধ্য অনুসারে চকোলেট কেক আইসক্রীম এনে দিতাম। মাসখানেক পরে বৌটি

একদিন কাজে এল না। জিজ্ঞেস করতে স্বামী বলল—গত রাত্রে আমার স্ত্রীর একটি ছেলে হয়েছে।

আমি অভিনন্দন জানিয়ে বাচ্চাটি ও মা কেমন আছে জানতে চাওয়ায় বলল ভালই আছে দুজনে। ভাবলাম অন্ততঃ ১০।১৫ দিন কাজে আসতে পারবে না। অনেকগুলি টাকা লোকসান হবে। কিন্তু তার পরদিন সকালেই দেখি বৌটি এসে ফল তুলছে, যেন কিছুই হয়নি। আমি তো একেবারে অবাক। আমি ভাবছিলাম আমাদের পরিবারের মায়েদের কথা। ছেলে হবার পর কতদিন তাঁরা শুয়ে থাকতেন। কত সেবা শুশ্রূষা, কত যত্ন! বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান লেখিকা পার্ল বাকের বই গুড আর্থ-এ পড়েছিলাম চীনা মা বাচ্চা হওয়ার পরের দিনই সকালে স্বামীর সঙ্গে ক্ষেতের কাজে যোগ দিয়েছিল। এখন দেখছি ইটালিয়ান মাও কত কষ্টসহিষ্ণু। দু'মাস এখানে কাজ করে অনেক ডলার রোজগার করে কলেজে ফিরে গেলাম।

আমার সঙ্গে একটি ছাত্র "লেবরেটারীতে" কাজ করত, থাকত আমার বাড়ীর পাশেই। দুজনের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার বাড়ী মিনিওপোলিস সহরে। সে জানাল যে কলেজের টার্ম শেষ হয়ে গেলে বাড়ী ফিরে যাবে। ঐ সহরের 'স্টেট কলেজ ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা'তে নাকি খুব বড় ভাল ভাল প্রফেসারও আছেন। আমার বন্ধু ঐ কলেজেই ভর্তি হবে। আমাকেও তার সঙ্গে সেই কলেজেই ভর্তি হতে অনুরোধ করল। আমি বললাম যে ভেবে দেখব। অন্য সব ছাত্র বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলাম কি করব? সকলেই বলল কলেজটি খুবই বড় ও সব বিষয়েই ভাল। কিন্তু ঐ সহরে ভীষণ 'কালো-সাদাতে' ঝগড়া। কালো আদমীদের অর্থাৎ নিগ্রোদের কাজ পাওয়া খুবই কঠিন। এখন আর আমি 'নাবালক' নই, সব বিষয়েই চোখ মুখ কান খুলেছে। নিজের ওপর বিশ্বাস ও ভরসাও হয়েছে। আমার চেহারা ও 'হিন্দু ছাত্র' বলেই যে এত খাতির পাচ্ছি সে বিষয়েও বেশ অহঙ্কার হয়েছে। আমার এমন সোজা নাক, সোজা চুল ও

চেহারা দেখেও কি নিগ্রো বা মোলাটো (Mulatto) বলে ভুল করবে ? মোলাটো হচ্ছে আমেরিকান ও নিগ্রো রক্তে যাদের জন্ম। অনেক মোলাটোর এত চমৎকার চেহারা যে কারও সাধ্য নেই তাদের নিগ্রো বলে সন্দেহ করে।

যাক্, পরের দিন বন্ধুকে বললাম—মিনেসোটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে তো খুবই ইচ্ছে করছে। কিন্তু শুনলাম তোমাদের ঐ দিকে 'কালাদের' ওপর ভীষণ ঘেন্না ও বিদ্বেষ। আমাকে কাজ করে খেতে ও কলেজে পড়তে হবে। কি যে করব ঠিক করতে পাচ্ছি না।

বন্ধুটি কট্‌মট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ, আমাদের সহরে নিগ্রো-বিদ্বেষ আছে, কিন্তু তাতে তোমার কি লোকসান? তোমাকে দেখে তো কেউ নিগ্রো বলে সন্দেহ করবে না? তোমার অন্য কোনও আপত্তি বা অসুবিধা না থাকলে ও সব কথা ভুলে যাও।

আমি তখন তার সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলাম। বাসায় ফিরে সকলকে বললাম—কলেজের ছুটি হলেই আমি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব।

মিনেসোটা

মাসখানেক পরে কলেজের টার্ম শেষ হয়ে দু'মাসের ছুটি হলো। আমি বন্ধুর সঙ্গে মিনেসোটা রওনা হলাম। সেখানে বন্ধুর বাড়ীতেই উঠলাম। তার মা বাবা ভাই বোন সকলেই খুব ভাল। আমাকে তাঁরা নিজের ছেলের মতই স্নেহ করতেন। দু'দিন পরে আমি Y.M.C.A-তে থাকার বন্দোবস্ত করলাম।

তিন-চার দিন পরে বন্ধু বলল—আগামী কাল হতে আমাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে কাজ করে টাকা রোজগার করার জন্য। তুমি একজোড়া রবারের বুট জুতো কিনে নাও।

কি কাজ জিজ্ঞেস করাতে বলল—আগে চল তো, দেখবে এই

কাজ করে কত টাকা রোজগার করব। আমি আগেও প্রত্যেক ছুটিতে এই কাজ করেছি।

পরের দিন ট্রেনে দেখি যে বন্ধু চারখানা ছোট ছোট মাছ ধরার হাত-জালও সঙ্গে নিয়েছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করাতে বলল,—এই হাত-জাল দিয়ে ব্যাং ধরে নিউ-ইয়র্কে চালান দেব। কারণ সেখানে গরমের ছুটিতে বহুলোক বড়সী দিয়ে মাছ ধরতে আসে ও জ্যান্ত ব্যাং অনেক টাকা দিয়ে কেনে।

দু'ঘণ্টার পরে একটি ছোট ষ্টেশনে নেমে আধ মাইল হেঁটে গ্রামের মধ্যে এক কৃষকের বাড়ীতে পৌছলাম। তারা আমাদের খুব আদর যত্ন করে ভেতরে নিয়ে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো ঘর দেখিয়ে বলল—এইটি তোমাদের থাকবার ঘর।

আমার বন্ধুটি আগেই তাদের চিঠি লিখে এখানে থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল। আমেরিকান কৃষকদের সঙ্গে আমাদের দেশের চাষীদের আকাশ-পাতাল তফাৎ। এদেশী কৃষকরা যেমন বড়লোক, তেমনি সুন্দরভাবে সাজানো ঘর, বাড়ী, ফুলের বাগান, ট্রাক্টার মোটার গাড়ী, বিজলী বাতী ইত্যাদি নিয়ে খুব ধনীর মত জীবন-যাপন করে, যা নাকি আমাদের দেশের অনেক বড় লোকেদেরও নেই।

কৃষকের তিন-চার বছরের মেয়েটি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। কিছু বলার আগেই তার মা মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন। পরের দিন কাজে যাওয়ার আগে যখন সব জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখছিলাম, তখন ঐ মেয়েটি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে আবার আমাকে এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। আমি একটু আদর করে কাছে ডেকে নাম জিজ্ঞেস করলাম। সাহস পেয়ে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—তুমি কি হিন্দু? কি করে জানল জিজ্ঞেস করাতে বলল—মা বলেছেন। তখন বুঝলাম, জীবনে এই প্রথম 'হিন্দু' দেখে যদি বেফাঁশ কথা কিছু বলে ফেলে সেই ভয়ে তার মা আগের দিন তাড়াতাড়ি মেয়েকে আমাদের ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে

গিয়েছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ছোট্ট মেয়েটির সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বিস্কুট ও লজেন্সের ভাগ রয়-অ্যাঙ্কেলকে না দিয়ে মেয়েটি কখনও খেত না।

আমরা রাবারের বুট জুতো পায়ে দিয়ে জলে দাঁড়িয়ে হাত-জাল দিয়ে একটা ডোবা হতে প্রথম দিনেই প্রায় আশিটা ব্যাং ধরলাম। ব্যাংগুলিকে খুব বড় একটা জলের চৌবাচ্চার মধ্যে খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার বন্দোবস্ত ঐ কৃষকই করে দিল। সাত-আট দিনের মধ্যে প্রায় পাঁচশো ব্যাং নিউ-ইয়র্কে চালান দিলাম। এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে খুব ভোরে চলে যেতাম। সারাদিন ব্যাং ধরে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরতাম। যখন কাছাকাছি সব গ্রামের ব্যাং ধরা হয়ে গেল, তখন এই কৃষক পরিবারকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে তার পাওনা দিয়ে অন্য এক গ্রামে এইভাবে খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে ব্যাং ধরতে লাগলাম। ছুটির দু'মাসের মধ্যে এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে ব্যাং ধরে হাজার হাজার ব্যাং বিক্রী করলাম। বন্ধুর নামেই 'চেক' আসত ও সেই হিসেব পত্র রাখত। ছুটি ফুরিয়ে গেল, বাড়ী ফেরার সময় হলো। খাওয়া থাকা ট্রেন-ভাড়া ইত্যাদি সব খরচ বাদে প্রায় ছ' হাজার ডলারের মত লাভ হয়েছে। আমাকে অর্ধেক টাকা দিয়ে বন্ধু বলল—এই নাও তোমার লাভের অংশ।

আমি অর্ধেক নিতে অস্বীকার করলাম। বললাম—তুমিই তো সব বন্দোবস্ত করা, কেমন করে ব্যাং ধরতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেওয়া, হিসেবপত্র রাখা, ব্যাং বিক্রী করা—সব করেছ। আমি কেবল তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ব্যাং ধরেছি মাত্র। আমার তো কোনও ধারণাই ছিলনা ব্যাং বিক্রী করে এত টাকা উপার্জন হবে। আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশী কাজ করেছ, তোমার অর্ধেকের চেয়ে বেশী টাকা পাওয়া উচিত।

বন্ধু বলল যে তায় বাবা তার সব খরচ দেন। ছুটীর মধ্যে নিজের রোজগারের টাকাটা শুধু আমোদ-আহ্লাদ, কোনও সখের জিনিষ কেনা ইত্যাদিতে খরচ করে। কাজেই অর্ধেক টাকা নিতে আমার

আপত্তি থাকতে পারে না। আমি তখন টাকা নিতে স্বীকার করলাম। বিলেত ও আমেরিকায় ধনী ও ভাল ঘরের ছেলেমেয়েরা এইভাবে অবসর সময়ে কাজ করে টাকা উপার্জন করে নিজেদের ইচ্ছেমত খরচ করে। আবার অনেক সময়ে তাদের বাবার ক্ষেত-খামার, ফল-ফুলের বাগানেও কাজ করে টাকা নেয়। এতে লজ্জা বা সংকোচের কোনও প্রশ্ন থাকে না। বাবা মা যেমন বিনে পয়সায় নিজেদের ছেলেমেয়েদের কখনও খাটিয়ে নেন না, এরাও তেমনি অনেক রকম কাজ করে নিজেদের হাত খরচ চালিয়ে নেয় বাবা মার কাছে না চেয়ে। বিদেশের সব জায়গাতেই এই রেওয়াজ আছে, শুধু নেই আমাদের দেশে। এমনিই তো আমাদের দেশে বয়স্ক লোকেরা বছরের পর বছর কাজের অভাবে আধপেটা খেয়ে থাকে, তাদের ছেলেমেয়েদের আর কি সুযোগ হতে পারে কাজ করবার ?

ইউনিভার্সিটীতে ছুটীর পর ভর্তি হতে, বই ইত্যাদি কিনতে, অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। আবার Y. M. C. A.-তে সেক্রেটারীর কাছে গেলাম কাজের খোঁজে। এক সপ্তাহ পরে সেক্রেটারী ডেকে বললেন—আগামী কাল একটি বাগান করার কাজ আছে, যদি চাও তবে এগ্রিকালচার-কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা কর।

তাঁর বাড়ীর ঠিকানা ও পরিচয়পত্র নিয়ে পরের দিন সকালে সেখানে গেলাম। প্রিন্সিপালের স্ত্রী বাগানে নিয়ে কোদাল, ঠেলাগাড়ী (Wheel-Barrow) ও একটা মাটির ঢিপি দেখিয়ে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন। কাজে লেগে গেলাম। ২।৩ ঘণ্টার ভেতরেই কাদা মেখে একেবারে ভূত হয়ে গেলাম। কারণ আগের দিন রাত্রে সারাক্ষণ টিপি টিপি বৃষ্টি হয়ে মাটী সব ভিজে গিয়েছিল।

বারোটার সময় দেখি পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপাল, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে আমার কাজ দেখছেন। আমি তাঁদের দিকে তাকাতেই প্রিন্সিপাল আমার নাম ধরে ডাকলেন। কাছে যেতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি কত দিন হলো আমেরিকাতে আছি, কলেজে কি কি

বিষয় নিয়ে পড়ছি, দেশে আমার কে কে আছেন, ইত্যাদি। কোথায় লাঞ্চ খাব তাও জিজ্ঞেস করলেন। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললাম যে কাছেই একটা রেষ্টুরেণ্ট আছে, সেখানে খেয়ে নেব।

তখন সেই অতি ভদ্র সৌম্য প্রিন্সিপাল ডাঃ গ্রাহাম সস্নেহে বললেন—তাই কি হয়! তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে।

মনে মনে ভাবলাম আমাদের দেশে কোনও সাধারণ ভদ্রলোক কখনও তার বাগানের মালী বা দিনমজুরের সঙ্গে এক টেবিলে খাওয়া দূরে থাক—এক ঘরে বসেও খাবেন না। অবশ্য আমি কলেজের ছাত্র, আমার সঙ্গে আমাদের দেশের সাধারণ দিনমজুরের কোনও তুলনা হয় না। তাছাড়া আমেরিকায় আমি "হিন্দু ছাত্র", কাজ করে নিজের খরচ চালাচ্ছি, সেইজন্য আমাকে অনেকে নানা ভাবে সাহায্য করতেন ও সাধারণ দিনমজুর বলে গণ্য করতেন না। যাক্, আমি হাত-পা, কাপড়-জামার কাদামাখা অবস্থা দেখিয়ে খেতে অস্বীকার করলাম।

প্রিন্সিপালের স্ত্রী বললেন—তাতে কি হয়েছে! তুমি ভেতরে এস, হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নাও।

আমাকে নিয়ে বাথরুম দেখিয়ে দিলেন, নূতন সাবান তোয়াল সব গুছিয়ে দিলেন। যত দূর সম্ভব পরিষ্কার হয়ে তাঁদের সঙ্গে এক টেবিলে খেলাম।

আমেরিকায় "শ্রমের মর্য্যাদা" এই ভাবেই দেয়। Y. M. C. A.-এর সেক্রেটারী ও ডাঃ গ্রাহামের মতো লোকদের ব্যবহারে বুঝে ছিলাম এদেশে দৈহিক পরিশ্রমকে কেউ ঘৃণার চোখে দেখে না। সৎ ভাবে পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনের মধ্যে উঁচু নীচুর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এই স্বাধীন দেশে প্রত্যেকেই সুযোগ পায় বড় হওয়ার জন্য। এব্রাহ্যাম লিঙ্কনের মত একজন অতি দরিদ্র ও সাধারণ মানুষও এই দেশের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ মহৎ চরিত্রের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁর নাম চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

এই ইউনিভার্সিটীতে তিন বছর পড়া শেষ করে "সিরাকিউস"

(Syracuse) ইউনিভার্সিটীতে New York State College of Forestry-তে ভর্তি হলাম। এখন আর ভয় ভাবনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অন্য লোকের পরামর্শ ও সাহায্য নিতে হয় না। সব বিষয়েই একেবারে সাবালক হয়ে গেছি।

ইউনিভার্সিটির "Cosmopolitan Club"-এ যোগ দিয়ে সেখানে থাকার বন্দোবস্ত করে নিলাম। এখানে প্রায় চল্লিশজন নানা দেশের ছাত্র থাকত। আমি ও একটি কিউবার ছাত্র ছাড়া আর সকলেই আমেরিকান। এখানেই বলে রাখি যে আমি যত বছর আমেরিকায় ও বিলাতে ছিলাম কোন দিনও ড্রিঙ্ক করিনি বা "ড্যান্সে যাইনি। এইজন্য সকলে আমাকে ঠাট্টা করে "প্রফেসর" বলে ডাকত। ঐ ক্লাবে একটি আমেরিকান ছাত্র ও আমি এক ঘরে থাকতাম। তার নাম ছিল 'রেজউইক'। তিন পুরুষ আগে এদের পরিবার রাশিয়া হতে আমেরিকায় এসে এখানের নাগরিক হয়ে গিয়েছিল। বাবা হচ্ছেন নিউইয়র্কের একজন বড় এঞ্জিনিয়ার। এদের পরিবারের সকলেই ছিলেন—"Agnostic" অর্থাৎ অজ্ঞানবাদী। আমরা দু'জনে একসঙ্গে এই বিষয়ে নানারকম বই পড়তাম। আমি স্বামী বিবেকানন্দের লেখা "কর্মযোগ" সম্বন্ধে যেটুকু পড়েছিলাম তা রেজেউইককে যতদূর সাধ্য বুঝিয়ে বলেছিলাম। সে তো সব শুনে একেবারে মুগ্ধ। বড়দিনের ছুটিটা তাদের বাড়ীতে 'এ্যালবামায়' কাটাতে অনুরোধ করল। তখুনি রাজি হলাম। যাওয়ার ইচ্ছে তো ছিলই, আবার না যেয়েই বা কি করব? আগেই তো লিখেছি—সব ছেলেরাই মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে চলে যায়। না গেলে একা একা বিরস-বদনে কেবল দেশের "পূজোর" কথাই ভাবব!

ছুটির পরে রেজউইক জার্মানীতে হিণ্ডেলবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেল। একদিন কথায় কথায় বলেছিল যে জার্মানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমেরিকানদের চেয়ে অনেক উচ্চে। ঐ সময়ে আমার জার্মানী ও জার্মানদের সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না। পরে যখন

জার্মানীতে গেলাম, তখন রেজউইকের কথা ঠিকই মনে হচ্ছিল। বন্ধু রেজউইক চলে যাওয়াতে আমার কিছুদিন খুবই একলা ও খারাপ লাগছিল।

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কানাডায় উইনিপেগ ষ্টেটে এক কৃষকের বাড়ীতে কাজ নিলাম। ঐ খামার-বাড়ী অতি আধুনিক ও প্রায় সব কাজই ইলেকট্রিকের সাহায্যে অতি সুষ্ঠুভাবে করা হতো। চাষ দেখা, বিদ্যুতের সাহায্যে গরু দোয়ানো, ঘোড়া গরু শূওর বেড়াল কুকুর হাঁস মুরগী গিনিপিগ খরগোস পায়রাদের খাওয়ানো, সমস্ত কাজ মাত্র তিনজনে আমরা করতাম। কোনও মুস্কিল হতো না। খুব ভাল মাইনে পেতাম। তাছাড়া খাওয়া-থাকা ফ্রি। তবে প্রায়ই শূওরের মাংস খেতে হতো। আমার ওই মাংস খেতে একটুও ভাল লাগত না। কাজেই আমি মাংসটা বাদ দিয়ে আলু কফি ডিম ইত্যাদি খেতাম। প্রচুর দুধ মাখন চীজ ক্রিম জ্যাম ও নানারকম ফল দিত। মাঝে মাঝে আমার জন্য মুরগীও রাঁধত। আমেরিকানরা খুব ভাল খাবার ও পরিমাণে অনেক বেশী খায়। খাওয়ার বিষয়ে কোনও রকম হিসেব বা কৃপনতা করে না!

বিলেতের ল্যাণ্ডলেডীরা ঠিক তার উল্টো! প্রায় উপোস করিয়ে রাখে, অতি সাধারণ ও অল্প পরিমাণে খাবার দেয়। আমেরিকানদের তুলনায় আমি অত্যন্ত অল্প খেতাম। অবশ্য ওদের চেহারাও বিরাট, ওজনও তেমনি, আমার খাওয়ার পরিমাণ দেখে খুব ঠাট্টা করত। বলত আমার চেয়ে ওদের হাঁস মুরগীরা অনেক বেশী খায়। আমি দেশে থাকতেও বাঙ্গালীর তুলনায় বরাবরই খুব অল্প পরিমাণ খেতাম। মা দাদারা বলতেন—বিজয়, তুমি বড় অল্প খাও! আমার দাদাদের থালায় ভাতের পরিমাণ দেখলে চক্ষু স্থির হতো। যাকে বলে বেড়াল লাফ দিয়ে ডিঙ্গাতে পারে না! ঐ রোগা রোগা শরীরে অত বেশী ভাত তরকারী কেমন করে খেতে পারতেন এখনও ভাবলে অবাক হই। যাক, দু'মাস কাজ করে অনেক টাকা নিয়ে কলেজে ফিরে এলাম।

বড়দিনের বন্ধে আমাদের ক্লাবে একজন মেয়ে-টিচার এলেন অস্ত

সহর থেকে X-mas এর জিনিস-পত্র কিনতে ও কয়েকদিন থাকতে ; আমি "হিন্দু" জেনে মহাখুসী। সারাক্ষণই "ভুত, আত্মা, পরকাল" এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন আমার সঙ্গে। কখনও আবার হাত দেখতেও বলতেন। এ সব বিষয়ে আমি কিছুই জানি না বলা সত্বেও তাঁর ধারণা ছিল যে আমি একজন মস্ত বড় পণ্ডিত, শুধু বিনয় বশতঃই স্বীকার করছি না। আমার পণ্ডিত পরিচয়ের কারণ আত্মা জীবন, মৃত্যু, পরলোক সবই (spiritualism) আমাদের হিন্দু ধর্মের বিষয়বস্তু। তাতে আবার এই সুদূর আমেরিকাতে তাঁর জীবনে এই প্রথম একজন "হিন্দুর" সঙ্গে সাক্ষাৎ! তাঁর আর উৎসাহের সীমা নেই। আমি কিন্তু এতদিন এসব কিছুই বিশ্বাস করতাম না। ভগবান যে আছেন সেটাও ঠিক স্বীকার করতাম না। অনেকটা "Agnostic"ই ছিলাম। কিন্তু এই সময়ে এমন একটা অলৌকিক ঘটনা এই ক্লাবেই ঘটল যাতে আমার এত বছরের অর্থাৎ সারাজীবনের বিশ্বাস ধারণা সব বদলে গেল। ভগবান আত্মা ইত্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস হলো।

ঘটনাটি হলো এই :—একদিন সকালে ব্রেকফাষ্ট খেতে এসে তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগটি পাশের চেয়ারে রাখেন। খাওয়ার পর ব্যাগের কথা একেবারে ভুলে বাইরে চলে গেলেন বড়দিনের বাজার করতে। সেদিন তাঁর অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল, কাজেই খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। দোকানে যেয়ে দেখেন হ্যাণ্ডব্যাগটি সঙ্গে নেই, শুধু দোকানের জিনিস ভরে নেওয়ার জন্য বড় একটা ব্যাগ এনেছেন। তখনি ফিরে এসে অনেক খুঁজলেন।

কিন্তু কোথাও হ্যাণ্ড-ব্যাগটা না পেয়ে মেট্রণকে ডেকে বললেন— তাঁদের ক্লাব হতে ব্যাগটা চুরি গেছে, তার ভেতরে পঞ্চাশ ডলার ছিল। মেট্রণ বেচারী লজ্জায় আর কোনও উপায় না দেখে এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ ডেকে আনলেন। তিনি এসে বাড়ীতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সকলকে নানা রকম জেরা করে যারা বাইরে গিয়েছিলেন তাঁদের জন্য অপেক্ষা করলেন। আমরা কলেজ-স্কুল হতে ফিরতেই এক

একজনকে ঘরে ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে চলে গেলেন।

টিচারটি সন্ধ্যাবেলা আমাকে ডেকে বললেন—রয়, চল আমরা গীর্জায় যাই। সেখানে মিসেস কে মিডিয়াম, প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করব কে আমার ব্যাগ নিয়েছে?

এর আগেও তিনি আমাকে অনেকবার গীর্জায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন, কিন্তু আমি যাইনি। আজও পড়ার অজুহাতে গেলাম না।

পরের দিন সকালে উঠে বাইরে এসে দেখি তিনি একলা বারান্দায় বসে আছেন। সকলেই তাঁকে ভুত আত্মা ইত্যাদি নিয়ে খুব ঠাট্টা করত বলে তিনি শুধু আমার সঙ্গেই এসব বিষয়ে আলোচনা করতেন। কারণ আমি একে তো হিন্দু, তাছাড়াও তাঁর কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম, যদিও কিছুই বিশ্বাস করতাম না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোমার ভূত ব্যাগ হারানোর কি বলল?

তিনি উঠে আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরে গেলেন। আমাকে বসতে বলে জানালেন যে স্পিরিট বলেছে যে লোকটা ব্যাগ ও টাকা নিয়েছে, তার গায়ের রং কালো। ব্যাগটা আগুনে পুড়ে গেছে ও টাকাটা মেয়েদের একটা ড্রেসিং-টেবিলের নীচের দেরাজে রেখে দিয়েছে।

আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম! বললাম—আমার রং তো কালো। তুমি কি মনে কর আমি তোমার টাকা নিয়েছি?

টিচারটি ভীষণ অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হয়ে আমার হাত ধরে বললেন, —'রয়, তুমি কেন এরকম অসম্ভব কথা মনে করছ? আমাদের দেশের লোকদেও তো রং ফর্সা ও ময়লা আছে। তুমি এসব বিষয়ে কিছু মনে করো না। যদি আমার কথায় কোন দুঃখ পেয়ে থাক তবে আমাকে ক্ষমা কর।

ক্ষমা করলাম বটে কিন্তু মোটেই শান্তি পেলাম না। কেমন যেন মনের মধ্যে অস্বোয়াস্তি লাগছিল। আমাদের ক্লাবে যে ছেলেটি টেবিলে

পরিবেশনের কাজ করত তার বাড়ী ছিল দক্ষিণ আমেরিকার একটি প্রদেশ 'পেরুতে' ও গায়ের রং আমেরিকানদের মত অত ফর্সা ছিলনা। আমার চেয়ে অতি সামান্য একটু ফর্সা ছিল। ক্লাবে কাজ করে বিনা পয়সায় খেতে ও থাকতে পেত আর হাইস্কুলে পড়ত। সব সময়ে আমার কাছে পড়া জিজ্ঞেস করতে আসত ও আমাকে খুব সম্মান করত। সেদিন রাত্রে ঐ ছেলেটির কাজ শেষ হওয়ার পরে তার ঘরে গেলাম। প্রথমে যীশুর ক্রশ ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম যে আমার প্রশ্নের উত্তরে সে সত্যিকথা বলবে। আমি যখন তাকে ব্যাগ ও টাকার কথা জিজ্ঞেস করলাম তখন সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল যে ঐ দিন সকালে যখন খাবার টেবিল পরিষ্কার করছিল তখন ব্যাগটি পেয়েছিল। টিচারটি তখন বাইরে চলে যাওয়াতে ভেবেছিল তিনি ফিরে এলে ঐ ব্যাগ হারানো নিয়ে বেশ একটু ঠাট্টা করে ব্যাগটি ফিরিয়ে দেবে। ব্যাগের ভেতরে প্রায় পনেরো ডলার ছিল, সেই জন্য কাউকে কিছু না বলে সে টাকা ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজে বন্ধ করে ব্যাগটি টেবিলের ওপরেই রেখে চলে যায়। আমাদের দেশের মত ঘরের দরজায় তালা দেওয়ার কোনও বালাই ছিল না ঐ সব দেশে। আমাদের অনুপস্থিতিতে ঝি এসে বিছানা পেতে, ঘর-আসবাবপত্র ঝেড়ে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখত।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তুমি মেট্রণের কাছে ব্যাগটা দিলে না কেন?

ছেলেটি বলল—আমি ভেবেছিলাম, টিচারটি ব্যাগ না পেয়ে একটু ঘাবড়ে যাবে, আমিও একটু মজা দেখব ও পরে ব্যাগটী ফেরৎ দিয়ে দেব। এত যে হৈ-চৈ হবে, গোয়েন্দাকে ডাকবে, স্বপ্নেও ভাবিনি।

স্কুল হতে ফিরে এসে ছেলেটি ব্যাগ খুঁজে না পেয়ে, আবার টিচারের মুখে ব্যাগের ভেতরে পঞ্চাশ ডলার ছিল শুনে এবং তার ওপর গোয়েন্দার জেরার ভয়ে ঘাবড়ে যেয়ে সব অস্বীকার করে। স্বীকার

করলেই তো ব্যাগ ও পঞ্চাশ ডলার ফিরিয়ে দিতে হবে। সে গরীব মানুষ এত টাকাই বা কোথায় পাবে? ব্যাগটিও তো অন্তর্ধান! আমি লক্ষ করে দেখলাম ওর ড্রেসিং-টেবিলটা মেয়েদের টেবিল। যেখানে ব্যাগটি রেখেছিল ঠিক তার নীচেই ছেঁড়া কাগজ-পত্র ফেলার ঝুড়িটা রাখা হয়েছে। আন্দাজ করলাম ঝি যখন ঘর ঝাড়তে এসেছিল তখন কোনও কারণে ব্যাগটা ঐ ঝুড়ির মধ্যে পড়ে যায়। ঝি না দেখে ঝুড়ির ছেঁড়া ময়লা কাগজপত্রের সঙ্গে ব্যাগটাও যে বয়লারে এ সব জঞ্জাল পোড়ানো হয় তার মধ্যে ফেলে দেয় ও সেটা পুড়ে যায়। ঐ ভীষণ শীতের রাত্রে আমরা দুজনে দুটি লাঠি ও টর্চ নিয়ে বাইরে সেই বয়লারের কাছে খুঁজতে আরম্ভ করলাম। স্তূপাকার ছাইয়ের মাঝে ব্যাগটির ষ্টিলের তৈরী হাতলটি ও বেষ্টনীটি (Rim) পেলাম। ব্যাগের চামড়াটি সম্পুর্ণ পুড়ে গিয়েছিল। ছেলেটিকে বললাম,—তোমার কোনও ভয় নেই আমি সব ঠিক করে দেব।

পরের দিন সকালে হাসতে হাসতে টিচারকে জিজ্ঞেস করলাম—সত্যি করে বল তো—তোমার "ভূত" ব্যাগের মধ্যে কত টাকা ছিল বলেছে?

তিনি তখন একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন—আমি আগের দিন পঞ্চাশ ডলার নিয়ে বেরিয়েছিলাম। কেনা-কাটাতে বেশীর ভাগ টাকাই খরচ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ঠিক মনে নেই কত টাকা ব্যাগে ছিল।

আমি তখন ছেলেটিকে ডেকে এনে টিচারকে সব খুলে বললাম। টিচার সব শুনে বিশেষতঃ স্পিরিচ্যুয়ালিজমে তাঁর বিশ্বাসের এমন অকাট্য প্রমাণ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পনেরো ডলার ছেলেটাকে X'mas-এর উপহার বলে দিয়ে দিলেন। আরও ঠিক করলেন আমরা কেউ এ বিষয়ে কাকেও কিছু বলব না। ক্লাবের সকলে ভাবল টিচারই কোথায় বাইরে ব্যাগ হারিয়ে ফেলে বিনা কারণে হৈ-চৈ করল। পৃথিবীতে কত রকম আশ্চর্য ও অলৌকিক

রহস্য আছে আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের সে সব বোঝবার কি ক্ষমতা আছে? ভগবানের সৃষ্টির অদ্ভুত ও অপরূপ শক্তির বিষয়ে আমরা আর কতটুকু জানি? এই অলৌকিক ঘটনার পর আমার নাস্তিকতা দূরে সরে গেল এবং ভগবান আছেন, আত্মা অবিনশ্বর সেটাও বিশ্বাস হলো। ঐ টিচারের সঙ্গে আমি এরপরে "প্রেততত্ত্বের" গীর্জায় যেয়ে তাঁদের আলোচনাচক্রে অনেকবার যোগ দিয়েছিলাম।

আমাদের ক্লাবের খাওয়া-দাওয়া, ঘর-দোর পরিষ্কার করা, দেখা-শোনা ইত্যাদি সব মেট্রণ করতেন। তাঁর নাম ছিল মিসেস মোনাহ্যান। তিনি নিজের মোটর চালিয়ে যাতায়াত করতেন, হাতে হীরের আংটী, গলায় আসল মুক্তোর হার ঝকঝক করত। সব সময়ে সুন্দর পোষাক পরে ফিটফাট থাকতেন।

আমার একজন বন্ধু একদিন আমাকে বলল—তুমি যে হিন্দু, ইণ্ডিয়া হতে এসেছ তা মিসেস মোনাহ্যান কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। কারণ তাঁর চেনা-শোনা অনেক আমেরিকান ভারতে আছেন এবং তাঁদের কাছে ভারতের "হিন্দুদের" বিষয়ে, অনেক শুনেছেন ও বহু ছবি ও ফটো দেখেছেন। সেইসব "হিন্দুদের" সঙ্গে তোমার চেহারা ও স্বভাবের একেবারেই মিল নেই।

আমি হেসে ঠাট্টা করে বললাম—বোধহয় তিনি যে সব ছবি ও ফটো দেখেছেন, তার মধ্যে আমার মত হিন্দুর কোনও চিহ্নই খুঁজে পাননি, সেইজন্যই বিশ্বাসও করেননি।

পাশ্চাত্য দেশের অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত হিন্দুদের বিষয়ে কিছু কিছু জানেন, কিন্তু মিসেস মোনাহ্যানের মত মেয়েরা আমাদের বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। তিনি এই প্রথম আমাকে দেখে কেন "হিন্দু" বলে বিশ্বাস করছেন না ঠিক বুঝতে পারলাম না।

একদিন সকালে কোনও কারণে আমি সকলের শেষে খেতে এলাম। মেট্রণ মিসেস মোনাহ্যান অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে

গল্প করলেন। শনিবার বিকেলে চা খেতেও নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর বাড়ীতে যেয়ে দেখি মেয়ে পুরুষে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন নিমন্ত্রিত এসেছে চা খেতে। মিসেস মোনাহ্যানের বাড়ী বেশ বড় ও সুন্দর সাজানো। শুনলাম মাসে একবার করে মিসেস মোনাহ্যান এই রকম চায়ের নিমন্ত্রণে সকলকে ডাকেন ও নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। বেশভুষা আচারব্যবহার দেখে মনে হলো সকলেই বেশ শিক্ষিত ও ভাল ঘরের। আমার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিসেস মোনাহ্যান অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, যেমন দেশে আমার বাড়ীতে কে কে আছেন, আমি "হোম-সিক" হই কিনা ইত্যাদি। সকলেই নানা রকম প্রশ্ন করলেন।

একটু ইতস্ততঃ করে মিসেস মোনাহ্যান বললেন, তাঁর কাছে আমাদের দেশের "হিন্দুদের" অনেক ছবি আছে। তাঁর মিশনারী বন্ধুরা ঐ সব ছবি পাঠিয়েছেন। এই বলে আমার হাতে দুই বাণ্ডিল **picture post-cards** দিলেন। কত দীর্ঘকাল পরে আমার দেশের লোকদের এতগুলি ছবি দেখব ভেবে, মহা উৎসাহে বাণ্ডিল খুলে পাঁচ-ছ খানা ছবি দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম! এ রকম ছবি জীবনে আর দেখিনি। ওইগুলি আমাদের দেশের জংলী সাঁওতাল কোল ভীল নাগা প্রভৃতির ছবি। তাদের প্রায় নেংটো চেহারা। মাথায় পাখীর পালক, হাতে তীর ধনুক। ছবিগুলির নীচে লেখা আছে—'হিন্দু মা ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে', 'হিন্দুদের শীকার', 'মাছধরা', 'এক টুকরো কাপড় সামনে ও পেছনে লেজের মত ঝুলিয়ে বানরের মত নারকেল গাছে চড়ছে'। হিন্দুদের বাড়ী ঘর আচারব্যবহার সব দেখানো হয়েছে। একটা ছবিতে দেখলাম প্রকাণ্ড এক নদী, মাঝখানে এক কুমীর প্রকাণ্ড হাঁ করে দাঁত বের করে আছে, তার সামনে প্রায় উলঙ্গ বুক খোলা এক "হিন্দু-মা" একটী শিশুকে কুমীরের মুখে ফেলে দিচ্ছে। নীচে লেখা আছে—'হিন্দুরা মেয়েসন্তান গঙ্গানদীতে কুমীরের মুখে ফেলে দিয়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট করে।'

আমার তো ঐ সব ছবি দেখে মাথার মধ্যে রাগে আগুন জ্বলছিল, কিন্তু নিজেকে খুব সংযত করে তখনি কোনও রকম কড়া জবাব দিলাম না। কারণ আমেরিকাতে 'হিন্দু' বলতে আমাদের দেশের সব জাতিকেই বোঝায়। ভারতবর্ষের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলকেই এরা হিন্দু বলে। এমন কি একদিন আমার এক প্রফেসার জিজ্ঞেস করলেন—রয়, তুমি কি 'হিন্দু দেশ' হতে এসেছ? মিশনারীরা যদি ছবিগুলির নীচে 'হিন্দুস্থানের আদিম-অধিবাসী'—(Aborigines) কথাটি লিখতেন, তবে কোনও আপত্তির কারণ ছিল না। মিশনারীরা ঐ সব ছবি পাঠিয়ে অসভ্য জংলী 'হিন্দুদের' আত্মার মুক্তির জন্য অর্থাৎ খৃষ্টান করার জন্য টাকা চেয়ে পাঠাতেন। আমাদের দেশের তখনকার ইংরেজ গভর্মেণ্ট কোনই প্রতিবাদ করত না। বরং এ বিষয়ে তাদেরও খুব সমর্থন ছিল। আমাদের ইংরেজ শাসকরা ছুনিয়াকে দেখাতে চেষ্টা করত তারা কত বড় স্বার্থত্যাগ করে এই অসভ্য অশিক্ষিত জাতটাকে মানুষ করার জন্যই আমাদের দেশে রাজত্ব করছে। এতে তাদের কোনই লাভ বা লোভ নেই। যদি মিশনারীরা আমাদের দেশের ভদ্র শিক্ষিত গুণী-জ্ঞানীদের ঘর-বাড়ী, সাজ-পোষাক, সৌন্দর্য, আদব-কায়দা এবং পৃথিবী বিখ্যাত অপূর্ব সৃষ্টি তাজমহল অজন্তা এলোরা, রাজা-মহারাজদের বিরাট বিরাট অতি সুন্দর প্রাসাদ, আকাশ-ছোঁওয়া হিন্দুদের মন্দির, মুসলমানদের মসজিদ্, আগ্রার কেল্লা ইত্যাদির ছবি পাঠিয়ে টাকা চাইত তবে কজন আমেরিকান এদের টাকা দিত? অবশ্য মিশনারীরা তাদের দেশের এই দানের টাকায় আমাদের দেশে বহু লোকের—যাদের আমরা ছুঁই না, অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করি, যাদের ছায়া মাড়াই না, রাস্তা দিয়ে হাঁটতেও দিই না, ভদ্র পল্লীর ও সমাজের বাইরে জন্তু-জানোয়ারের মত বসবাস করতে বাধ্য করিয়ে যত নোংরা কাজ করিয়ে নিই,—সেই সব দুঃখী লোকদের 'মানুষ' করছেন ও লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন। এই দানের টাকাতেই কত স্কুল-কলেজ হাসপাতাল খুলেছেন ও এখনও এইসব

মহৎ কাজ করছেন। মিশনারীরা আমাদের দেশের লোকদের জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ করেছেন ও অনেক অনেক মহৎ কাজ করছেন সেটা স্বীকার করতেই হবে। তাঁদের স্থাপিত স্কুল-কলেজে খৃষ্টান কেন, হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানরাও উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে ও এখনও পাচ্ছে। তাঁদের হাসপাতালে ধনী দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত জাতি-ধর্ম নির্বিচারে সকলকেই সযত্নে চিকিৎসা করে রোগ মুক্ত করছেন। স্বামী বিবেকানন্দের "মানস-কন্যা" সিষ্টার নিবেদিতা, সার উইলিয়াম্ জোন্‌স, ডেভিড হেয়ার, বেথুন সাহেব, ডাফ সাহেব—এঁদের মত মহৎদের কথা আমরা কোনদিনও ভুলব না। এঁদের অসাধারণ ত্যাগ ও মানবতার উদাহরণ আমাদের দেশের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এমন কি মাইকেল মধুসূদনের মহাকাব্য "মেঘনাদ-বধ" লেখা হয়েছিল রেভারেণ্ড বেথুন সাহেবের উৎসাহে ও প্রেরণায়। আমাদের দেশে প্রথম স্ত্রী-শিক্ষার আরম্ভ হয় এই মহাপুরুষদের উৎসাহে ও চেষ্টায়।

যাক্, 'চা পর্ব' শেষ হলো। মিসেস্ মোনাহ্যান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার বোধহয় এই ছবিগুলি দেখে দেশের কথা খুব মনে হচ্ছে ?'

রাগের চোটে একবার মনে হলো দিই আচ্ছা করে ছ'কথা শুনিয়ে। আবার খুব দুঃখ ও লজ্জা হচ্ছিল, কেন না ওগুলি তো আমাদের দেশের লোকদেরই ছবি। আমরাই তো ওদের অমনি করে দূরে সরিয়ে রেখেছি, কখনও চেষ্টা করিনি ওদের 'মানুষ' করতে। যাক্, নিজেকে অতি কষ্টে সামলে নিয়ে অতগুলি বিদেশী ও অপরিচিত মেয়ে-পুরুষদের দিকে তাকিয়ে বেশ স্বাভাবিক স্বরেই বললাম—হ্যাঁ, এসব ছবি আমাদের দেশের লোকদেরই, যাদের তোমরা বলছ হিন্দু। কিন্তু ভুলে যেও না, তোমাদের দেশের মতই আমাদের দেশেও জাতি-ভেদ আছে।

সকলেই এক বাক্যে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন—আমেরিকাতে কোনও রকম জাতি-ভেদ নেই।

আমি উত্তর দিলাম—নিশ্চয়ই আছে। তোমরা যেমন রেড-ইণ্ডিয়ান এস্কিমো নিগ্রোদের সাথে মেলামেশা, সামাজিকতা কর না, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাও ঠিক সেই রকম তাদের আদিম-অধিবাসীদের সাথে মেশে না। পোষ্ট কার্ডের ছবিগুলি দেখিয়ে বললাম—এই ছবিগুলি ভারতের ওই সব অশিক্ষিত জংলী আদিম অধিবাসীদের ছবি। আমি যদি তোমাদের রেড-ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমোদের বাড়ী-ঘর, সাজ-পোষাক, মাথায় পাখীর পালখ, হাতে তীর-ধনুক, সারা গায়ে নানারকম রং মাখা ছবি পাঠিয়ে দিয়ে আমার আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা কখনও আমেরিকান দেখেননি তাঁদের লিখি—এরা সব আমেরিকান, এই তাদের বাড়ীঘর, সাজ-পোষাক, আচার-ব্যবহার,আমেরিকানরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, শিকার করতে যাচ্ছে, আমেরিকান হাতুড়ে ডাক্তার (witch doctor) রুগীকে দেখছে,—তবে নিশ্চয়ই আমার কথা মিথ্যে হবে না? এরাও তো ঠিক তোমাদের মতই আমেরিকাবাসী?

চারদিক হতে সকলেই উত্তেজিত ভাবে বলতে লাগল—এভাবে আমেরিকানদের বিষয়ে ভুল বোঝালে খুবই অন্যায় হবে ও মিথ্যে বলা হবে।

আমি উত্তর দিলাম—এইসব ছবি পাঠিয়ে এদেশে আমাদের হিন্দুদের বিষয়েও অত্যন্ত ভুল ধারণা প্রচার করা কি অন্যায় হচ্ছে না?

তখন সকলেই সব বুঝতে পেরে, একেবারে চুপ হয়ে গেল। ধর্ম ও সামাজিকতার কথা বাদ দিয়ে অন্য সব বিষয়ের আলোচনা চলল।

বাড়ী এসে ভাবতে লাগলাম কেমন করে এই সব অজ্ঞ আমেরিকান-দের ভারত ও হিন্দুদের বিষয়ে কিছু যদি বোঝাতে পারি। আমরা এদের দেশের খবর কিছুটা জানি, কিন্তু এরা আমাদের দেশের ও আমাদের বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। ইণ্ডিয়া দেশটা যে কোথায় সেটাও অনেকে জানে না। এখন এত যুগ পরেও দেখছি আমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের বংশের ইতিহাস জানে না, অথচ ব্রিটিশ

ও আর সব বিদেশী রাজা-মহারাজাদের চোদ্দপুরুষের বংশাবলী মুখস্থ। আমরা স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও বিদেশীরা যে ইণ্ডিয়ার বিষয়ে কত অজ্ঞ তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি—১৯৫২ সালে বিলেতের লেক-ডিস্ট্রিক্টে যে সহরে কবি. 'Wordsworth'-এর সমাধি আছে, সেইখানে নাম করা হোটেল উইণ্ডমেয়ারে গরমের ছুটি কাটাচ্ছিলাম। হোটেলে নানাদেশের শিক্ষিত সভ্য ও সম্ভ্রান্ত পর্যটকরা ছিল। সকলের সঙ্গেই আলাপ ও বন্ধুত্ব হলো। মেয়েরা তো আমার স্ত্রীর নানা রং-এর শাড়ী দেখে মুগ্ধ। রোজ রাত্রেই তাঁকে অনেক মেয়েকে শাড়ী পরিয়ে ডিনারের সময় সাজিয়ে দিতে হতো, দিনের বেলায় ফটো নেওয়ার ধুম। অনেকেই আমাদের জিজ্ঞেস করল—আমরা কোন দেশের লোক? আমরা তো গর্বের সঙ্গে বললাম,—আমরা ইণ্ডিয়া হতে এসেছি, যে দেশ মাত্র পাঁচ বছর আগে স্বাধীনতা পেয়েছে।

কয়েকজন বললেন—ইণ্ডিয়া কোথায়? আফ্রিকাতে? স্বাধীনতা পেয়েছে নাকি?

এত রাগ হয়েছিল ওদের অজ্ঞতা দেখে। যাকে বলে ওরা একেবারে নিরেট!

যাক্, ভাবতে লাগলাম কোথায় কি ভাবে এদের কাছে আমাদের দেশের খাঁটী কথা প্রচার করব? অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম যদি ভাল ভাল ছবি দেখিয়ে আমাদের দেশের গৌরবের ইতিহাস, সভ্যতা, কলা, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে এদের আগ্রহের ও আনন্দের সৃষ্টি করতে পারি, তবে স্কুল-কলেজে, ক্লাবে, গির্জায় (Sunday School) ও আরও অনেক জায়গায় আমার কথা শোনাবার জন্য শ্রোতারও অভাব হবে না।

আমেরিকানদের প্রধান গুণ হচ্ছে এরা সব সময়েই ছোট-বড় সকলকেই সব বিষয়ে সুযোগ দেয়। এদের নূতন নূতন বিষয় শোনার ও শিখবার আগ্রহ অত্যন্ত বেশী। কাকেও প্রথমেই দমিয়ে দেয় না। একবার যদি কোনও বিষয়ে বিশ্বাস করান যায়, তবে এদের মত

'দিল-খোলা' উদার প্রাণ, সহানুভূতিভরা সমর্থক খুব কমই দেখা যায়। সেই জন্যই অতি সাধারণ ঘরের গরীব ছেলে এব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছিলেন। অনেক বছর এদেশে ছিলাম, অনেক ভালবাসা আদর যত্ন সহানুভূতি সাহায্য অফুরন্ত অজস্র পেয়েছি। কারও বিরুদ্ধে কোনও বিষয়ে অনুযোগ বা অভিযোগ করার কারণ আমার নেই।

নিউইয়র্কে বিভিন্ন কোম্পানীতে লিখে ল্যান্ট'ান-স্লাইডের অনেকগুলি লিষ্ট এনে, তার থেকে বেছে বেছে প্রায় দেড়শো স্লাইডের অর্ডার দিলাম। পাবলিক লাইব্রেরীতে বসে দিনের পর দিন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এনসাইক্লোপেডিয়া হতে আরম্ভ করে, যত বই পেলাম সব পড়ে নোট লিখে একটা খাতা তৈরী করলাম। ঐ সব বই থেকে বেছে আরও পঞ্চাশখানা ছবি স্থানীয় স্লাইডের দোকান হতে তৈরী করালাম। ম্যাক্সমুলার, ডসন, প্যায়ারী লোটী, থিওডোর, ডিগবী ইত্যাদির যত গবেষণামূলক ও নানা দেশীয় পরিব্রাজকের লেখা বইগুলি হতে ভারত সম্বন্ধে বহু মাল-মশলা যোগাড় করে ফেললাম। আমার বক্তব্যগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে সেই অনুসারে স্লাইডের ছবিগুলিরও নম্বর দিলাম। যাতে বক্তৃতা দিতে কোনও রকম ওলট-পালট না হয়ে যায়। আমার বক্তৃতার নাম দিলাম "ভারত ও তার অধিবাসী" (**India and Her People**)।

অনেক দূরের এক সহর হতে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের একখানা জরী-পাড় ধুতিও যোগাড় করলাম। স্থানীয় দর্জিকে বুঝিয়ে একটি পাঞ্জাবীও তৈরী করালাম। এক বাঙ্গালী মহিলা—প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী লীলা দেশাইয়ের মা—শ্রীযুক্তা সত্যবালা দেশাইয়ের একখানা সিল্কের শাড়ী গায়ের চাদর হিসেবে ব্যবহার করব বলে চেয়ে নিলাম। তিনি মিঃ দেশাই নামে এক গুজরাটী ভদ্রলোককে বিয়ে করে আমেরিকায় ছিলেন। তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন ও নাম ধরে ডাকতেন।

ভেক না হলে ভিখ মেলে না! সেইজন্যই এইভাবে জোড়াতালি দিয়ে "জাতীয়-পোষাক" তৈরী করলাম। হ্যাণ্ডবিলের ওপর ঐ রকম পোষাক পরা আমার ফটোও ছাপিয়ে দিলাম। এতে খুবই কাজ হয়েছিল। কারণ শুধু ঐ পোষাক দেখতেই বহু লোক আমার বক্তৃতায় আসত, বিশেষতঃ মেয়েরা! সব তো তৈরী, কিন্তু বক্তৃতা কোথায় দেব? কে শুনবে? এতগুলি টাকাও খরচ হলো, সেগুলি তো ওঠানো চাই সুদে আসলে! বন্ধু রেজউইককেও জিজ্ঞেস করলাম। সে স্থানীয় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বলল। বিজ্ঞাপনের উত্তরে বহু জায়গা হতে অনুরোধ আসল বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। বেশ টাকাও দিতে চাইল সকলেই। কিন্তু কাজ করে, কলেজে পড়ে, দূরের সহরে ওদের সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলাম না। কিছুদিন পরে আমাদের ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন হলো। আমার সব বন্ধুরা বিশেষতঃ রেজউইক খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাকে ওই দিনে ল্যাণ্টার্ন স্লাইড দেখিয়ে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করল। কলেজের ক্লাব হতে ল্যাণ্টার্ন অপারেটার ঠিক করা হলো। বহু ছাত্র-ছাত্রী, তাদের মা-বাবা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রফেসাররা ও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। বড় হলঘর ভরে গেল। আমার প্রফেসার আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বক্তৃতা ও স্লাইড দেখানোর পর খুব হাততালিও পেলাম। কারও কোনও প্রশ্ন করার ইচ্ছে আছে নাকি জিজ্ঞেস করলাম।

একজন মহিলা উঠে বললেন—"আচ্ছা তোমাদের এত সভ্যতা ও শিক্ষা থাকতেও তোমরা "পুতুল-পূজো" কর কেন?

প্রথম হতেই আমি ঠিক করেছিলাম আমার বক্তৃতায় কোনও রকম রাজনৈতিক বা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা থাকবে না। কারণ এতে অনেক রকম তর্ক-বিতর্ক হয়ে বিরোধ ও তিক্ততার সৃষ্টি করে। যাক্, ঐ মহিলাটির প্রশ্নের উত্তরে বললাম—তোমাদের মত হিন্দুরা "সকল লোক সমান" একথা বিশ্বাস করে না! তোমরা নিজেরাও বিশ্বাস কর না। কিন্তু সেটা স্বীকার করতে চাও না। আমরা লোকের

কুল-শীল বিদ্যাবুদ্ধি আচার-ব্যবহার জ্ঞান ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে তাকে সেই স্তরে দেখি। ভারতের হিন্দু ধর্ম এক বিশাল বটগাছের মত। নানাভাগে এই ধর্মকে বিভক্ত করে ঈশ্বর হতে আরম্ভ করে বহু দেব-দেবী গাছ পাথর এমন কি সাপ ইত্যাদির মধ্যে দিয়েও যার যেমন বিশ্বাস সে সেইভাবে ভগবানকে পূজো করে শান্তি ও তৃপ্তি পায়। তারা হাতে ফুল চন্দন নিয়ে পূজোর মন্ত্র বলে—"হে ঈশ্বর তোমাকে আমরা চোখে দেখতে পাইনা, তোমার বাণী কানে শুনতে পাইনা। তুমি আমাদের ধারণার অগোচর, তুমি সব জায়গায় বিরাজ করছ, তুমি আমার এই অর্চনা গ্রহণ কর।" তোমরা যাকে বল "পুতুল-পূজো" এটা কিন্তু ঠিক তা নয়। ঐ "পুতুল-পূজোর" মধ্যে দিয়ে সকলেই একই ভগবানকে বিশ্বাস করে ও পূজো করে। সমস্ত নদীই নানাভাবে নানা দেশের ভিতর দিয়ে বয়ে শেষে সাগরেই পৌঁছে যায়। আমাদের হিন্দু ধর্মও সেই রকম। যেভাবেই আমরা যার মাধ্যমেই পূজো করিনা কেন সব পূজোই শেষে দেবতার চরণে পৌঁছে দিই। তোমরা যেমন যীশুর মেরীমাতার ছবি বা মূর্তি বাড়ীতে বা গীর্জায় রেখে প্রার্থনা কর, ফুল ফল দিয়ে পূজো কর, আমরাও তেমনি নিজেদের বিচার বুদ্ধি ও বিশ্বাস অনুযায়ী ভগবানের মূর্তি নানা রকমের তৈরী করে নানাভাবে পুজো করি। আমাদের "পুতুল-পূজো" ঠিক সেই রকম। আমার মনে হয় আমাদের হিন্দু ধর্ম খুবই উদার। সকলকেই সুযোগ দেওয়া হয়। যেভাবে যে বিশ্বাস করে, সে সেইভাবেই যেন ভগবানকে পূজো করতে পারে। তোমরা সকলেই খৃষ্টান। যীশুর "মহাবাণী" সকলেই গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে কি সফল হতে পেরেছিল? একই মাপের কোট সকলের গায়ে ঠিক মত না হওয়াতে, ইচ্ছে অনুযায়ী কোটটিকে ছেঁটে কেটে তৈরী করে নিয়েছ। অর্থাৎ তোমরাই খৃষ্টান ধর্মকে নানাভাবে ভাগ করে নিয়েছ, যেমন ক্যাথলিক প্রটেষ্টাণ্ট মেথডিষ্ট ব্যাপটিষ্ট, খৃষ্টান সায়ান্স ইত্যাদিতে নিজেদের সুবিধা ও বিশ্বাস মত। আমরা এটাও জানি যীশুর জন্মের আগেই

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পরিব্রাজকরা প্যালেষ্টাইনে পৌঁছেছিলেন ও জন দি ব্যাপটিষ্ট তাঁদের দেখেই গেরুয়া রং-এর আলখেল্লার মত পোষাক পরতেন ও মধু ফল খেয়ে থাকতেন।

ভদ্রতার খাতিরেই হোক বা যে কারণেই হোক সকলেই আমার বক্তৃতা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন ও অত্যন্ত প্রশংসা করলেন হাততালি দিয়ে। ভারত সম্বন্ধে এমন পরিষ্কার ও সহজ বক্তৃতা এই প্রথম তাঁরা শুনলেন।

একজন প্রফেসার উঠে বললেন,—আমি ভারত সম্বন্ধে খুবই অল্প জানতাম। আর যা জানতাম সবই তাদের কুসংস্কার অশিক্ষা অনগ্রসরতা অসভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে। আজ মিঃ রায়ের বক্তৃতা শুনে আমার চোখ কান খুলে গেল। ইণ্ডিয়াকে এখন থেকে নূতন চোখে দেখব ও নূতনভাবে বুঝতে চেষ্টা করব।

যাক, যে জন্য আমি এত কষ্ট ও এত পরিশ্রমের টাকা খরচ করে বক্তৃতা দেওয়া ঠিক করেছিলাম সেটা সফল হলো। খুবই তৃপ্তি ও আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

এর পরে আমার আর কোনও ভাবনাই ছিল না। প্রত্যেক স্থানীয় খবরের কাগজে আমার ছবি ও বক্তৃতা ছাপিয়ে দিল। অনেক জায়গা থেকে বহু প্রসিদ্ধ লোক ও সমিতি আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করল। একমাস পরে বিখ্যাত “ইতিহাস-সমিতি” আমাকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করলেন। সব বন্দোবস্ত তাদের আর আমাকে পঞ্চাশ ডলার দেবে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমার মত একজন অজানা ও অতি সাধারণ ছাত্রকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ ডলার দেওয়া বেশ একটু গৌরবের বিষয় ছিল। ঐ সমিতিতে বক্তৃতা দিতে যেয়ে দেখি বিরাট হলভর্তি লোক। তিল ধারণের জায়গা নেই। বক্তৃতার শেষে আমি ভেতরে যেয়ে পোষাক বদলে আমার দেশের পোষাক ধুতি পাঞ্জাবী পরে ও চাদর গায়ে দিয়ে দাঁড়ালাম। সেকি হাততালির ধুম ও প্রশংসা। সারি বেঁধে মেয়ে

পুরুষরা দাঁড়িয়ে ছিল আমার সঙ্গে "সেক-হ্যাণ্ড" করবে, আমাকে ধন্যবাদ দেবে, আমার পোষাকে একটু হাত দেবে এই আশায়। আগেই বলেছি আমেরিকানরা নূতন কথা শুনতে ও নূতন কিছু দেখতে অত্যন্ত ভালবাসে। খুবই উৎসাহ ও আগ্রহ তাদের এসব বিষয়ে। সেই জন্যই আজও পৃথিবীতে আমেরিকান টুরিষ্টদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। বহু আমেরিকান সারা জীবন টাকা বাঁচিয়ে বৃদ্ধ বয়সে পৃথিবী ভ্রমণে বা নূতন দেশ দেখতে বের হন।

এই বক্তৃতা দিয়ে আমার দুই উদ্দেশ্যই সফল হলো—ভারত সম্বন্ধে অনেক আমেরিকানের ভুল ধারণা দূর করা ও সেই সঙ্গে কিছু টাকা রোজগার করা।

গরমের ছুটিতে কানাডায় একটি ষ্টেটে কাঠের কাজে গেলাম। সেখানে এক জায়গায় বক্তৃতা দিতে যেয়ে এক মহিলা—মিসেস ওয়েমাররের সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁর স্বামী কাঠের কারবারে লক্ষপতি। ছেলেমেয়ে ছিল না। মিসেস ওয়েমার আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। প্রায়ই বাড়ীতে নেমতন্ন করে ভাল ভাল খাবার খাওয়াতেন।

একদিন তাঁরা দুজনেই বললেন—রয়, তোমার মতো সৎ ছেলের খৃষ্টান হওয়া উচিত ছিল।

আমি হেসে বললাম—কেন, হিন্দুদের মধ্যে কি সৎ ছেলেদের থাকা উচিত নয়?

মিসেস ওয়েমার তাড়াতাড়ি বললেন,—না, না, তা নয়, তবে জানই তো—আমরা কাউকে ভাল বলতে হলে বলি—**He is a perfect Christian gentleman.** আমাদের ছেলেমেয়ে নেই। তুমি খৃষ্টান হলে তোমাকে "দত্তক পুত্র" করে নিতাম।

যাক্, এখানেই একথা শেষ হলো, আর বেশী দূর গড়াল না। যতদিন সেখানে ছিলাম তাঁদের কাছে খুবই আদরযত্ন পেয়েছি। অনেক উপহারও দিয়েছিলেন।

দু'মাস কাজ করে অনেক টাকা নিয়ে কলেজে ফিরে এলাম। আমার বোটানি ক্লাশের একটি মেয়ে ও তার মার সঙ্গে কলেজের "ক্যাম্পাসে" দেখা হলো।

মা বললেন,—মিঃ রায়, তোমার কথা আমার মেয়ের কাছে শুনেছি। তোমার ছবি ও বক্তৃতাও অনেক কাগজে দেখেছি। একদিন আমাদের মেয়েদের ক্লাবে যদি তুমি বক্তৃতা দাও, তবে আমরা সকলেই খুবই সুখী হব।

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল —মা, মিঃ রায়কে কিন্তু একশো ডলার ফি দিতে হবে।

আমি তো বেশ একটু অবাক হলাম। কারণ একশো ডলার তখনকার দিনে একটা মোটা টাকা। মা তখনি রাজি হলেন। আমি পরে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম—কেন সে এত বেশী টাকা চাইল?

উত্তরে মেয়েটি বলল—কেন চাইব না? আমার মা ওই মহিলা ক্লাবের সভানেত্রী আর সেখানে অনেক ধনী মহিলা আছেন। অনেক বুড়ী সেখানে টাকার পাহাড়ে বসে আছে, আমি ওই বুড়ীদের দু'চোখে দেখতে পারিনা। তাদের কিছু টাকা খরচ হোক্।

যথাসময়ে ক্লাবে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ছাপানো নিমন্ত্রণ চিঠি এল। গিয়ে দেখি ঘর ভর্তি শুধু মহিলা—নানা বয়সের, নানা সাইজের। সভানেত্রী মেয়েটির মা আমাকে অভ্যর্থনা করে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বক্তৃতা শুনে সকলেই মহা খুসী ও অজস্র প্রশংসা করল। একজন জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের হিন্দু বলে কেন?

আমি বললাম—আমাদের পূর্বপুরুষরা আর্যজাতি ছিলেন। তাঁরা যখন প্রথমে সিন্ধুনদের তীরে এসে বসবাস শুরু করলেন, তখন পারস্য দেশের লোকেরা আমাদের পরিচয় দিতে লাগল—'সিন্ধুনদের তীরের লোক'। আস্তে আস্তে সেটা ছোট্ট হোয়ে সিন্ধু হলো। পার্শীয়ানরা

'স' ঠিক না বলে 'হ' উচ্চারণ করত। কাজেই সিন্ধু হলো "হিন্দু" এবং হিন্দুদের বসবাসের দেশ "হিন্দুস্থান" হলো। অনেক অনেক বছর পরে যখন হিন্দুস্থান ভরত নামে এক রাজার অধীনে এল, তখন আমাদের দেশের নাম হলো ভারত বা ভারতবর্ষ।

আর একজন মহিলা বললেন—যাই বলো, তোমাদের পোষাকের (ধুতি, পাঞ্জাবী) মধ্যে কিন্তু ঠিক 'সভ্যতা" বা আবরু নেই।

আমি উত্তর দিলাম—প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া অনুসারে পোষাকের সৃষ্টি হয়। আর পোষাকের সভ্যতা ও আবরুর কথা যখন জিজ্ঞেস করছ তখন বলছি—শত শত বছর আগে তোমাদের পূর্বপুরুষরা যখন গুহায় জঙ্গলে পশুর চামড়া পরে জীবন যাপন করতেন, সেই সময়েই আমাদের দেশে পৃথিবী বিখ্যাত মস্‌লিন তৈরী হতো। সেই অতি সুন্দর সূক্ষ্ম কাপড় মিশর ইত্যাদি নানাদেশে মহিলারা পরম আদরে ও গৌরবে পরিধান করতেন। যদি সমস্ত শরীর ঢেকে পোষাক পরাই সভ্যতার মাপ-কাঠি হয়, তবে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সভ্য জাতি হচ্ছে এস্কিমো। কারণ তাদের চোখ ও নাক ছাড়া সমস্ত শরীরই ঢাকা থাকে। আমাদের দেশের লোকেরা তোমাদের স্নানের ও নাচের পোষাক দেখলে লজ্জায় মরে যাবে। ভাববে কি অসভ্য লোক এরা! অথচ তোমরা আমাদের পোষাকে সভ্যতা নেই বলে ক্রুটি ধরছ!

আমার এই জবাবের পরে আর কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন না। সভানেত্রী অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তৃতার অনেক প্রশংসা করলেন। মেয়েটির যা আনন্দ। আমাকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল —বেশ করেছ! বুড়ীদের মুখের মত জবাব দিয়েছ!

এই আমার শেষ বছর আমেরিকাতে। মাত্র চারটি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করলেই কলেজের পড়া শেষ হবে। সকালের দিকে কলেজে পড়তাম। বিকেলে কাজ নিয়েছিলাম এক "ক্লিপিং" অফিসে। প্রায় ৪০।৫০ খানা নানারকম খবরের কাগজ আসত। সেই কাগজগুলি হতে বেছে বেছে নানারকম বিষয় সম্বন্ধে লেখাগুলি কেটে

বিভিন্ন অফিসে পাঠিয়ে দিতাম। ঐ ক্লিপিং অফিসের মালিক আমাকে খুবই ভালবাসতেন। আমাকে রায় বলে না ডেকে "Sun-Kissed Child of the East" বলে ডাকতেন।

ওই অফিসেই একদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আমিই সেই 'হিন্দু রায়' নাকি যার বক্তৃতা খবরের কাগজে পড়েছিলেন, ছবিও দেখেছিলেন? তাঁর অনুমান সত্যি বলাতে আমার বক্তৃতা কেমন চলছে, কোথায় এখন কাজ করছি সব জিজ্ঞেস করলেন। আমার এইটাই শেষ বছর, কাজেই খুব বেশী সময় পাই না বাইরে বক্তৃতা বা কাজ করার জন্য এ-কথা শুনে বললেন যে দুপুরে যদি মাত্র এক ঘণ্টার জন্য আমি টেবিলে খাবার পরিবেশনের কাজ করতে স্বীকার করি, তবে তিনি তাঁদের ক্লাবে আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন। দুপুরের ফ্রি লাঞ্চ ও পঞ্চাশ ডলার করে পাব প্রতি সপ্তাহে অর্থাৎ মাসে দু'শো ডলার। আমি তখনি রাজি হয়ে তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। তিনি ওই 'Business-Club'-এর সেক্রেটারী ছিলেন। পরের দিনই কাজে যোগ দিলাম। আমেরিকান ব্যবসায়ীরা দুপুরে বাড়ীতে লাঞ্চ খেতে আসেন না। ক্লাবেই খাওয়াটা শেষ করেন। সবাই যাঁরা বাইরে কাজ করেন, কেউ দুপুরে বাড়ীতে খান না। আমাদের দেশের লোকের মত সকালেই নাকে মুখে কোনও রকমে ভাত তরকারী গিলে অফিসে ছোটেন না।

আমার টেবিলে এগারো জন ধনী ব্যবসায়ী লাঞ্চ খেতেন। প্রথম সপ্তাহেই মাইনে ছাড়াও প্রায় ৮০।৯০ ডলার বেশী পেলাম বখশিশের (Tips) জন্য। বিলেত, আমেরিকা ইত্যাদি সব দেশেই প্রত্যেক কাজে টিপস দিতে হয়। ফ্রান্সে সিনেমা থিয়েটারে সিট দেখিয়ে দিলেও বখশিশ দিতে হয়। হোটেল রেষ্টুরেণ্টে তো কথাই নেই। বেশ মোটা রকম বখশিশ পকেট থেকে বেরিয়ে যায়। ট্যাক্সি-ওয়ালাদেরও ভাড়া ছাড়াও টিপস দিতে হয়। একে তো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র,

তাতে আবার হিন্দু, যাকে বলে সোনায়-সোহাগা। ভারত সম্বন্ধে ছবি দেখিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে কাজ করে কলেজের পড়ার, খাওয়া-থাকার খরচ চালাচ্ছি এ কথাটা সকলেই সেক্রেটারীর কাছে শুনেছিলেন। কাজেই আর সব পরিবেশনকারীদের চেয়ে আমাকে অনেক বেশী বখশিশ দিতেন সাহায্য করার জন্য। দু'মাস পরেই X'mas এল। 'Merry X'mas' বলে প্রত্যেকেই আমার হাতে ২০।৩০ ডলারের নোট দিলেন। ঐ সব ধনীদের কাছে ২০।৩০ ডলার অতি সামান্য, যেন কয়েকটি পয়সা মাত্র। X'mas-এর সপ্তাহেই আমি প্রায় ৩০০ ডলারের মতন নগদ টাকা পেলাম, তাছাড়া নানারকম উপহার—টাই, রুমাল, মাফলার, টাই-পিন অনেক কিছুই। সারা সপ্তাহ বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে নেমতন্ন খেলাম। তাদের উৎসবে যোগ দিয়ে তাদের সঙ্গে দিনও কাটালাম। এই প্রথম আমি X'mas-এ বাইরে গেলাম না। কিন্তু আমার একটুও খারাপ লাগল না। তখন আমার এত বন্ধু হয়েছিল যে আর একা-একা X'mas কাটাতে হলো না। তিন মাস কাজ করে সব খরচ চালিয়ে প্রায় এক হাজার ডলার জমালাম। কিন্তু এখানেও বেশী দিন টিকতে পারলাম না। কারণ, ওই ক্লাবের স্থায়ী পেশাদার পরিবেশনকারীরা ভীষণ হিংসে করতে লাগল আমি অত বেশী বখশিশ পাচ্ছি দেখে। আমি থাকাতে তাদের ভাগটা অনেক কমে গেল। রাঁধুনী হতে আরম্ভ করে সকলেই আমাকে নানাভাবে জব্দ করতে চেষ্টা করল। ইচ্ছে করেই আমার টেবিলের খাবার দিতে এত দেরী করত যে পরিবেশন করা অসম্ভব হয়ে উঠত। আমেরিকায় সময়ের মূল্য অত্যন্ত বেশী। খাবারের জন্য অপেক্ষা করে সময় নষ্ট হওয়াতে আহারকারীদের খুব অসুবিধা হতো।

আমি সেক্রেটারীকে সব বুঝিয়ে বলে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চাকরী ছেড়ে দিলাম। তিনি খুবই দুঃখিত হলেন, বললেন—যদি কখনও কিছুর দরকার হয়, আমি যেন তাঁকে জানাতে দ্বিধা না করি।

সকালে কলেজ, বিকেলে কাজ, তারপর রাত জেগে পরীক্ষার পড়া।

তৈরী করে ৪।৫ ঘণ্টার বেশী ঘুমাতে সময় পেতাম না। সকলেই উপদেশ দিল এভাবে বিশ্রাম না নিয়ে সারাদিন খেটে এত অল্প সময় ঘুমালে শরীর একেবারেই ভেঙ্গে যাবে। অতি ভোরে কেউ ওঠবার আগেই কয়েকটা বাড়ীতে মাটির নীচের ঘরে তাদের আগুনের বয়লার পরিষ্কার করে ঠিকঠাক করে দিতাম, যাতে সারাদিন ঠিক মত জ্বলে ও সারা বাড়ী গরম থাকে, সারাক্ষণ গরম জলও পাওয়া যায়। বন্ধু-বান্ধবরা সকলেই আমাকে খুব অনুরোধ করলেন ওই ভোরের কাজগুলি যেন ছেড়ে দেই।

উত্তর দিলাম—যদি দেখি পেরে উঠছি না আর শরীরও খারাপ হচ্ছে তবে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব।

মনে মনে ভাবলাম "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাই তাই সয়"। নিজের মনকে এইভাবে দৃঢ় করলাম যে আমাদের দেশেরই ভগবান রামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ চোদ্দ বছর না ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলেন, আর আমি ৪।৫ ঘণ্টা ঘুমিয়ে মাত্র কয়েকটি মাস কাটাতে পারব না? দেশে ফিরতে হবে। কবে কোথায় কত মাস পরে চাকরী পাব—কিছুই ঠিক নেই। টাকার আমার বড় প্রয়োজন। কিছু টাকা জমিয়ে সঙ্গে নিতেই হবে। আমেরিকা ছাড়া কোনও দেশেই আমাদের মত লোকের এত টাকা, এত সহজে রোজগার করার কোনও সম্ভাবনাই নেই। যাক্, প্রায় সাত মাস আমি এইভাবে কাজ করে পড়াশোনা করলাম ও টাকাও বেশ জমালাম। কোনও রকম কষ্ট বা শরীর খারাপ মোটেই হয়নি।

যখনি কোনও বিষয়ে হতাশা ও বাধা-বিঘ্ন আসত, তখনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব গান মনে মনে গাইতাম—"তা'বলে ভাবনা করা চলবেনা, ও তোর বারে বারে ঠেলতে হবে, হয়তো দুয়ার খুলবেনা। একলা চল, একলা চল, একলা চলরে।" এই গানটি আমার জীবনে "বীজ-মন্ত্রের" কাজ করত। কবিগুরু যখন এই গান লিখেছিলেন তখন তিনি কখনও ভাবেননি তাঁর এই গানের প্রভাবে বাংলাদেশের

অতি ছোট্ট একটী গ্রামের ছেলে এই সুদূর আমেরিকাতে বিনা সম্বলে বিনা সাহায্যে নিজের জীবনের গতি ফিরিয়ে নেওয়ার পথ খুঁজে পাবে। বহু বছর পরে যখন রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হয়েছিল, তখন একটি বাংলা মাসিক পত্রিকায় "একটি গ্রামের ছেলের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছিল আমারই জীবনের এই কাহিনী নিয়ে।

ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেরিকা

"ইউনাইটেড ষ্টেটের" মত এরকম একটা মিশ্র দেশ দুনিয়াতে আর নেই। বহু বছর আগে ইউরোপের যত নিগৃহীত গরীব ও অসহায় লোকেরা তাদের দেশের পুরোহিত ও ধনীদের অত্যাচারের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার আশায় এই দেশে এসে মাথা উঁচু করে রোজগার করে সুখে শান্তিতে মানুষের মত বাস করতে শুরু করে। অবশ্য প্রথমে তাদের খুবই কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়েছিল। অনেক বিপদ, অনেক বাধা-বিঘ্ন অসুবিধা পার হয়ে আজ তাঁদের দেশ "আমেরিকা" পৃথিবীতে সব চেয়ে সমৃদ্ধিশালী, ক্ষমতাশালী ও গণতান্ত্রিক হয়েছে। কত তাড়াতাড়ি সব বিষয়ে উন্নতি করা যায় সকলের মনে সারাক্ষণ সেই চিন্তা। কে কত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বর্ত্তমান জীবনটা কাটাতে পারবে সেই সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত। ভবিষ্যতে বা পরলোকে কি হবে সেটা নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। দুনিয়ার "কুবের-ভাণ্ডার" যেন এই আমেরিকাতেই রয়েছে।

আমরা যেমন বেশীর ভাগ দেব-দেবীর নামে 'নামকরণ' করি, এরা তেমনি জিনিষপত্র জন্তুজানোয়ার ইত্যাদি যা মনে আসে তাই দিয়ে নামকরণ করে যেমন, **Mr. Long, Mr. Short, Mr. White, Mr. Black, Mr. Little Wood, Mr. Poor, Mr. Rich, Mr. Whitehead, Mr. Broadfoot, Mr. Bull, Mr. Fisherman**— এই রকম অদ্ভুত অদ্ভুত নাম!

আমাদের "ইকনমিক্স" ক্লাসে আশিজন ছাত্র ও ছাত্রী পড়ত। একদিন এক প্রফেসার আমাকে ডেকে বললেন—রয়, তোমাদের হিন্দু নামের কোনও পদ্ধতি নেই। কেন কি ভাবে তোমাদের নামকরণ হয়, কিছুই বোঝা যায় না।

আমি তখন আমাদের নাম কিভাবে হয় সব বুঝিয়ে দিলাম। আবার প্রফেসারকে একটু জব্দ করার জন্য বললাম,—বরং তোমাদের নামগুলিই কি রকম খাপছাড়া ও অতি অদ্ভুত ধরণের। যখন শুনি মানুষের নাম মিঃ ষাঁড়, মিঃ শেয়াল, মিঃ সাদামাথা, মিঃ ছোট কাঠ ইত্যাদি তখন বেশ হাসি পায়।

এই বলে একটা মজার গল্প বললাম,—এক ভদ্রলোকের পাঁচটি মেয়ে ছিল। চার মেয়েরই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। স্বামীদের নাম ছিল— **Mr. Short, Mr. Brown, Mr. Little** ও **Mr. Poor**। সবচেয়ে ছোট মেয়েটীর বিয়ে হলো **Mr. Hog**-এর সাথে। বিয়ের ভোজে মেয়েদের বাবা উঠে বক্তৃতা দিলেন—বন্ধুগণ, আমি আমার পাঁচ মেয়েকেই যথাসাধ্য ভাল রকম শিক্ষা দিয়েছি যাতে তারা পরিবারের ও সমাজের গৌরব হতে পারে। কিন্তু আজ দেখছি আমার এত ভাবনা চিন্তা কষ্ট ও টাকা খরচের ফল হলো **Short Brown Little Poor Hog** প্রাপ্তি! আমার এই গল্প শুনে সকলের কি হাসি! প্রফেসারটি বেশ লজ্জা পেলেন, কারণ তিনি চেষ্টা করেছিলেন আমাকে একটু জব্দ করবেন, কিন্তু নিজেই জব্দ হলেন।

ইউরোপের মত এদেশে "Sir" কথাটি নেই বললেই হয়। একজন কাজের জন্য টাকা দেবে, অন্যজন তার বুদ্ধি বিদ্যা ও পরিশ্রম দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করবে। এর মধ্যে উঁচু-নীচু প্রভু-ভৃত্যের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এরা কথা বলে নাকী সুরে। মন খুবই উদার ও সহজেই লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। নিজেদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যেয়ে এক পরিবারের লোকের মত ব্যবহার করে, যেটা ইংরেজদের মধ্যে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। 'পরিচয়-পত্র' (**Introduction**)

না নিয়েও সকলের কাছে উপস্থিত হওয়া যায়। এরা কোনও রকম ভূমিকা ভালবাসেনা। সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর ভালবাসে। আমেরিকানরা শিক্ষার বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখে ও কোটি কোটি টাকা খরচ করে দেশের লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে এর জাতি গঠনের শ্রেষ্ঠ কারখানা মনে করে। প্রত্যেক স্কুল-কলেজে কো-এডুকেশন আছে, অবশ্য শুধু মেয়েদের জন্যও কয়েকটি কলেজ আলাদা আছে। এমন চমৎকার বন্দোবস্ত যে, যত গরীবই হোক না কেন লেখাপড়া শেখার কোনও বাধা হয় না। জীবন যুদ্ধে যত রকম শিক্ষার দরকার হয় সব শেখানের বন্দোবস্ত আছে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা যেন জীবন্ত বিদ্যুতের তার। সমস্ত সময়েই উৎসাহে আনন্দে প্রাণপণ চেষ্টা করছে কেমন করে দুনিয়াতে সবার শ্রেষ্ঠ হবে। পেছনে তাকানোর সময় তাদের নেই। জীবনের উচ্ছল তরঙ্গে কেবল এগিয়েই যাচ্ছে। এদেশে থাকলে এদের সংস্পর্শে 'জীবন-হীন' মানুষও "পরশ-মণির" ছোঁয়ায় নব-জীবন পায়। এদের কি অসাধারণ মনের জোর, কত দৃঢ়তা! 'বড়' হতেই হবে, মানুষের মত মাথা উঁচু করে সকলের মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কোনও বাধাই মানব না, কিছুতেই থামব না।

এদেশে প্রত্যেক বড় সহরেই পাবলিক লাইব্রেরী আছে। সেখানে নানাদেশের নানা বিষয়ের শত শত বই থাকে। সব লাইব্রেরীই রোজ খোলা থাকে, এক রবিবার ছাড়া। যে কেউ সেখানে ইচ্ছামত বই বেছে নিয়ে পড়তে পারে। শুধু বাড়ীতে বই নিলে নাম-ঠিকানা লিখতে হয়। আমেরিকায় হোটেলগুলি খুবই আরামের জায়গা। আশিভাগ লোকরাই হোটেলে জীবন কাটায়। ঘর-সংসার রান্না-বান্নার কোনও ঝামেলা থাকে না। অবশ্য ভাল মন্দ আমেরিকাতেও আছে। সব দেশের মতোই আলো আঁধার, সুখ দুঃখ, সবই পাশাপাশি আছে।

এদেরও আমাদের দেশের লোকের মতোই অনেক কুসংস্কার আছে। যেমন এক টেবিলে তেরোজন লোক খেতে বসবে না, একটী দেশালাই

কাঠীর আগুনে তিনজন সিগারেট ধরাবে না টেবিলে লবণ পড়লে ডান কাঁধের ওপর দিয়ে সামান্য একটু লবণ ফেলে দেবে, আয়না ভাঙ্গলে দুঃখ পাবে, ওপরের সিঁড়িতে উঠতে হোঁচট খেলে বিয়ে হবে না, কফিতে দুধ মেশালে যে ফেনাটা হবে, সেটা না ভেঙ্গে চামচ দিয়ে অতি সাবধানে খেতে হবে—এই রকম অনেক কিছু আছে।

আমেরিকায় যখন ইউরোপীয়ানরা প্রথম বাস করতে আরম্ভ করল, তখন কয়েকটি বন্দর ছাড়া সব দেশটা বিস্তীর্ণ জঙ্গল ছাড়া আর কিছু ছিল না। জঙ্গল কেটে রাস্তা-ঘাট বাড়ী-ঘর তৈরীর ও ক্ষেত-খামার তামাক তুলো ইত্যাদির চাষের জন্য লোকজনের বড়ই অভাব ছিল। পর্তুগীজরা এই সুযোগ নিয়ে আফ্রিকা হতে হাজার হাজার নিগ্রোদের জোর করে ভুলিয়ে বা চুরি করে এনে আমেরিকানদের কাছে বিক্রী করতে লাগল। ইংরেজরাও এরকম লাভজনক ব্যবসার গন্ধ পেয়ে নিগ্রো মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা ছেলে-মেয়েদেরও বিক্রী করে দুহাতে টাকা রোজগার করতে লাগল। এইসব ক্রীতদাসদাসীদের ওপর যে অমানুষিক ভয়াবহ অত্যাচার করা হতো সেই বিষয়ে মিসেস ষ্টো 'আনকেল টম'স কেবিন' নামে বিশ্ববিখ্যাত একখানা বই লিখলেন। দুনিয়ায় কোনও দেশে কোনও জাতির একখানা বইতে এত উপকার হয়নি, যা নাকি হয়েছিল 'আনকেল টম'স কেবিন' বইতে। এই বইখানি বোধ হয় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষাতেই অনুবাদ হয়েছিল। 'আনকেল টম'স কেবিন' বই পড়ে সারা আমেরিকাতে মহা আন্দোলন সুরু হলো। মার্কিন দেশের উত্তর দিকের মালিকরা তাদের হাজার হাজার ক্রীতদাসদাসীদের যথেষ্ট অসুবিধা ও ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও মুক্তি দিল। কিন্তু দক্ষিণ দিকের লোকেরা ক্রীতদাস-দাসীদের মুক্তি দিতে একেবারেই অস্বীকার করল। এই নিয়ে দুই দলে ভীষণ ঝগড়া ও মনোমালিন্য চলে। এই অন্যায় অত্যাচার বন্ধ না করতে পেরে উত্তর আমেরিকানরা দক্ষিণ আমেরিকানদের ওপরে শুধু যে চটে গেলেন তা নয়, তাদের ব্যবসায়ও যথেষ্ট ক্ষতি হতে লাগল।

কারণ বিনা মাইনেয় ক্রীতদাসদের পশুর মত অতি নিষ্ঠুরভাবে চাবুক মেরে মেরে খাটিয়ে দক্ষিণীরা প্রচুর লাভ করত, উত্তরের লোকেরা নিগ্রোদের মাইনে দিয়ে দিনরাত জোর করে না খাটিয়ে ওদের সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা করতে পারত না। যদি কোনও কারণে ক্রীতদাস দাসীরা প্রাণ পণে কাজ করেও মনিবদের দাবী মেটাতে না পারত, তবে তাদের চাবুক মেরে মেরে ফেলত বা জ্যান্ত পুড়িয়ে মারত। এই অমানুষিক নিষ্ঠুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও বিচার বা নালিশ ছিল না। মা-বাপের বুক থেকে শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে গরু ভেড়ার মত বাজারে বিক্রী করে দিত। অনেক সময় দক্ষিণের আমেরিকান পুরুষরা নিগ্রো দাসীদের দেহ সম্ভোগ করে তাদের গর্ভের সন্তানদেরও বাজারে বিক্রী করে দিত। এই 'আধা-ফর্সা' ছেলে মেয়েরা অনেক টাকায় বিক্রী হতো, বিশেষতঃ মেয়েরা। এই সব নিগ্রো-আমেরিকানদের ফর্সা ছেলেমেয়েদের "মোলাটো" (Mulatto) বলত। নিগ্রো মায়েদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রী বন্ধ করার জন্য কখনও কখনও নিগ্রো মায়েরা সদ্যোজাত শিশুদের নিজহাতে মেরে ফেলত ভবিষ্যতের নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত হতে মুক্তি দিতে !

এই সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিঙ্কণ রূপে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হলো। তিনি ঘোষণা করলেন, যে মানবতার নামে এই ভয়াবহ অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করতেই হবে। সমস্ত নিগ্রো দাসদাসীদের মানুষের মর্যাদা দিয়ে মুক্ত করতেই হবে। সমস্ত আমেরিকা মহাদেশ হতে ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়ে দিতেই হবে চিরদিনের জন্য। তিনি নিগ্রো ক্রীতদাস-দাসীদের মুক্তির জন্য দক্ষিণ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ও যুদ্ধে জিতলেন। কিন্তু মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও নিগ্রোদের ওপর অন্যায় অত্যাচার বন্ধ হলো না। কোনও কারণে নিগ্রোরা দোষ করলে তাদের বিচার আইন আদালতে না করে, আমেরিকানরা নিজেরাই তাদের শাস্তি দিত। অতি সামান্য কারণে তাদের মেরে ফেলত, যাকে বলে "লিঞ্চ" (Lynch) করা। দক্ষিণ

আমেরিকাকে বড় করছি, এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা শুনে ওই অফিসারটির মুখ চোখ একেবারে রক্তবর্ণ ধারণ করল। পারলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রেই ফেলে দিত! অত্যন্ত রেগে বলল—আমেরিকানরা চিরদিনই লম্বা চওড়া কথা বলতে ও বৃথা গর্ব করতে ওস্তাদ। তুমিও দেখছি কয়েকবছর ওদের দেশে কাটিয়ে আর কিছু শেখ না শেখ, ওদেরই মত বেশ বুলি আওড়াতে শিখেছ? এই দেখনা এত বড় মহাযুদ্ধটা এত বছর ধরে আমরা যুঝলাম, আর শেষের দিকে আমেরিকানরা যুদ্ধে যোগ দিয়ে বাহাদুরী করে পৃথিবী শুদ্ধ সকলকে বলছে যে ওরাই যুদ্ধে জয়লাভ করেছে! এমন মিথ্যে অহঙ্কার আর সহ্য করা যায়না।

উত্তরে বললাম,—আমাদেরও কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস আমেরিকানরা যুদ্ধে না নামলে তোমাদের অতি প্রিয় স্বদেশী গানটি—"ইংল্যাণ্ড সব সময়েই থাকবে" (There will always be an England) বন্ধ হয়ে যেত!

অফিসারটি আর একটি কথাও না বলে একেবারে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। যাকে বলে আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলা! এর পরে দেখা হলে, কথা বলাতো দূরে থাক গুড-মর্নিং বা গুড-ইভনিং পর্যন্ত বলত না!

লণ্ডন

কয়েকদিন অনবরত চলার পর জাহাজটি 'সাউদামটন' বন্দরে থামল।

জাহাজ হতে নেমে ঠিক উল্টো দিকে এসে মেল ট্রেনে উঠে বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই পাশ দিয়ে একটি ইঞ্জিন চলে গেল। আমার বেঞ্চেবসা এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন—ওই যে ইঞ্জিন এসে ট্রেনের সঙ্গে লাগল। এইবার আমাদের ট্রেন ছাড়বে।

একজন আমেরিকান যাত্রী আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন—তুমি কি বলছ? ওই ছোট্ট ইঞ্জিন (Donkey Engine) আমাদের ট্রেন লণ্ডনে পৌঁছে দেবে?

সত্যি বিলেতের ট্রেনের তুলনায় আমেরিকান ট্রেনের ইঞ্জিনগুলি বিরাট ও অতি দ্রুত বেগে চলে।

লণ্ডনে পৌঁছলাম। শুধু একটি স্যুটকেস নিয়ে ট্যাক্সিতে অক্সফোর্ড-ষ্ট্রীটের সেণ্ট্রাল Y.M.C.A-তে গেলাম।

সেখানে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে বললাম—আমি একজন Y.M.C.A-এর মেম্বার। এইমাত্র আমেরিকা থেকে পৌঁছেছি। এখানে কয়েকদিন থেকে পরে দেখে শুনে অন্য জায়গায় থাকার বন্দোবস্ত করে নেব। আমি এই প্রথম ইংল্যাণ্ড এসেছি। কাকেও চিনি না। এখানে জায়গা না থাকলে অন্য Y.M.C.A-তে থাকার বন্দোবস্ত করে দাও।

আমি অবশ্য খুবই নম্রভাবে তাকে অনুরোধ করলাম। কিন্তু সেক্রেটারী বিরক্ত হয়ে বললেন—আগামী কাল যুদ্ধ-জয়ের (Armistice) উৎসব। হাজার হাজার লোক বাইরে থেকে এসে লণ্ডন ছেয়ে ফেলেছে। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই।

শুনে বললাম—তাই যদি হয় তবে তোমার এই অফিসের এক কোণার সোফাতে আমার শোওয়ার জায়গা করে দাও। যে পর্যন্ত আমি কোনও ভারতবাসীকে খুঁজে না পাই ও থাকার বন্দোবস্ত না করতে পারি, সে কদিন আমার এখানে থাকতেই হবে। এছাড়া আমি আর কোনও উপায় দেখছি না।

সেক্রেটারী কয়েক মিনিট পরেই ওপরে চলে গেলেন! আমি গ্যাঁট হয়ে বসে থাকলাম। মনে মনে বেশ জানি ইংরেজদের ভারতবাসীদের প্রতি কত দরদ! প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেক্রেটারী নীচে এসে একটু ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি এখনও বসে আছ? কি ঠিক করলে?

উত্তর দিলাম—আগেই তো বলেছি আমি লণ্ডনে এই প্রথম এসেছি, কাকেও চিনি না। আর তুমিই তো বললে যুদ্ধজয়ের উৎসবে বাইরে

থেকে এত লোক এসেছে যে লণ্ডনের কোনও হোটেলে তিল-ধারণের জায়গা নেই।

খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার ওপরে চলে গেলেন। ফিরে এসে বললেন—এই মাত্র একটি ছেলে বাইরে চলে গেল দিন কয়েকের জন্য। তুমি সেই ঘরে থাকতে পারবে এক সপ্তাহের জন্য।

অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চাবি নিয়ে ওপরে সেই ঘরে গেলাম। বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে ফিরে দেখি একজন আমার বিছানা করছে। ঘরে তুখানা খাট ছিল। জিজ্ঞেস করলাম—এ ঘরে আর কে আছে?

উত্তর দিল যে প্রায় দেড় মাস এ ঘরে কেউ থাকে নি। মনে মনে ভাবলাম—হে ভগবান, ধাপ্পাবাজী দেখি সব দেশেই আছে। খৃষ্টানের দেশে Y.M.C.A-তে তোমার ভক্ত বিলেতী সাহেব, সেও মিথ্যে কথা বলে আমাকে ধাপ্পা দিল! ক্রমে ক্রমে জানলাম এই সেণ্ট্রাল Y.M.C A-তে কেবল সাদা চামড়াদের থাকতে দেয়। আমাদের মত (যদিও আমার গায়ের রং দেখে আমাকে কেউ 'কালা-আদমী' ভারতবাসী বলে বিশ্বাস করতনা) হিদেনদের জন্য নয়। সেক্রেটারী যখন দেখলেন যে আমি একেবারে নাছোড়বান্দা, তখন বাধ্য হয়ে একটা ঘরে থাকতে দিলেন। যার শেষ ভাল, তার সব ভাল!

ইণ্ডিয়া হাউস

পরের দিন সকালে চা খেয়ে রিডিং-রুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, তখন এক ভারতীয় ভদ্রলোক এসে কাগজ পড়তে আরম্ভ করলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম যে ক্রমওয়েল রোডে ইণ্ডিয়ান গভর্নমেণ্ট নবাগত ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ইণ্ডিয়া-হাউস নামে একটি বাড়ী রেখেছেন।

সেইদিন বিকালেই ওই ২১, নম্বর ক্রমওয়েল রোডের বাড়ীতে গেলাম। মেট্রণের সাথে দেখা করে জানলাম নুতন লোক বিলেতে

পৌঁছে এই ইণ্ডিয়া হাউসে দশ দিন থাকতে পারে। কিন্তু খাওয়া থাকার খরচ Y. M. C. A-এর খরচের চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশী। নীচে ড্রইং-রুমে প্রায় দশ-বারো জন বাঙালী ছেলেও ছিল। জোৎস্না দে নামে একটি বাঙালী ছেলের সঙ্গে ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো। তিনি "কেম্ব্রিজে" পড়েন। বাবা হচ্ছেন কিরণচন্দ্র দে, I.C.S.। বাংলাদেশের একজন কমিশনার। তখনকার যুগে খুব অল্পসংখ্যক ভারতবাসীই কমিশনারের উচ্চপদে নিযুক্ত হতেন। ঐ সব চাকরী ইংরেজদেরই একচেটিয়া ছিল। তাঁর অনুরোধে "ইণ্ডিয়া-হাউসেই" রাতের খাওয়া শেষ করে Y.M.C.A.-তে ফিরে গেলাম। সেখানের নিয়ম ছিল রাত ন'টার মধ্যেই ফিরতে হবে। সেইজন্যই বোধহয় ছেলেরা বেশীদিন Y.M.C.A.-তে থাকতে চাইত না। এই কারণেই আমি ঘর পেয়ে গেলাম ঐ উৎসবের ভীড়ের মধ্যেও। বাইরে থাকার চেষ্টা না করে ওইখানেই থেকে গেলাম। সেক্রেটারিও আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

রোজ জাহাজ অফিসে যেয়ে খোঁজ নিতাম কলকাতা বা বম্বে যাওয়ার কোন জাহাজে জায়গা খালি আছে কিনা? সব অফিসেই এক কথা "স্থান নেই, স্থান নেই"। ঠিক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই ভীষণ ভীড়। সব জায়গাতেই শুনলাম পাঁচ-ছ' মাসের আগে কোন জাহাজে 'বার্থ' পাওয়া যাবে না। ভীষণ সমস্যার মধ্যে পড়লাম। এতদিন বসে বসে খেলে জাহাজ ভাড়ার টাকাই বোধহয় কম পড়ে যাবে। এ তো আর আমেরিকা নয় যে একটা কিছু কাজ যোগাড় করে নিয়ে, যতদিন ইচ্ছে বেশ আরামে ও সচ্ছলতায় দিন কাটাব। আগে যদি জানতাম এমন মুস্কিলে পড়ব জাহাজে বার্থ যোগাড় করতে তবে ৫।৬ মাস পরেই আমেরিকা হতে বিলেতে আসতাম। যাক্ যতদূর সম্ভব খরচ কমিয়ে দিলাম। বাইরে সস্তার রেষ্টুরেণ্টে খেতে আরম্ভ করলাম।

বিলাতের পার্লামেন্টে

১৯১৯ সনে 'স্বায়ত্ত-শাসনের' দাবীতে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে "কনফারেন্স" ও তর্কাতর্কি চলছিল, তার সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা এখানে সম্ভব নয়। তাছাড়া ওই বিষয়ে সকলেই অনেক জানেন। আমি রোজই "হাউস অফ লর্ডস"-এ যেয়ে বসে বসে সব শুনতাম ও দেখতাম। ভারত হতে আমাদের বড় বড় নেতারা—মিসেস এ্যানি বেশান্ত, সরোজিনী নাইডু, লর্ড সিনহা, মিঃ জিন্না, মিঃ মাধব রাও প্রভৃতি অনেকেই এসেছিলেন। এঁদের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয়ও হলো। তাছাড়া যে সব ইংরেজ—সার আর্চভেল আর্থ, সার ফ্রাঙ্ক, সার বাকল্যাণ্ড ভারতের পক্ষে কথা বলতেন, তাঁদের সঙ্গেও আলাপ হলো। সকলেই আমাকে রোজ দেখতেন ও মুখোমুখি দেখা হলে অত ব্যস্ততার মধ্যেও সব সময়ে আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করতেন। সবাই বেশ একটু স্নেহের চোখেই দেখতেন আমাকে। এই ইণ্ডিয়ান রিফর্ম কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন—লর্ড মেলবর্ণ ও মিষ্টার মণ্টেগু, সেক্রেটারী অফ ষ্টেটস। এঁদের তুজনের সঙ্গে শুধু "গুড মর্নিং" ও "গুড ইভিনিং"—এই পর্যন্তই কথা হতো।

কনফারেন্সে তর্ক-বিতর্কের সময়ে আমাদের দেশের নেতাদের বিবেচনা-বুদ্ধি ও উপস্থিত-বুদ্ধি (presence of mind) দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। একদিন "ডাইহার্ডরা" (আমরা তাদের 'সিডেনহ্যাম কোম্পানী বলতাম। কারণ তাঁদের নেতা ছিল বম্বের গভর্নর লর্ড সিডেনহ্যাম) বলল যে শতকরা আশি ভাগ ভারতবাসীর শিক্ষা নেই। ভাল মন্দের বিচার করার ক্ষমতা নেই, কোনও বিষয়ে পারদর্শিতা নেই। স্বায়ত্ত শাসন পেলে কি করে শাসন কার্য চালাবে?

মিঃ জিন্না তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"ম্যাগনা-কার্টা" সাক্ষরের পর যখন "পার্লায়ামেণ্ট" গঠন করা হয়, তখন বিলাতের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ভারতের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। তোমাদের দেশের সেই অশিক্ষিত লোকরাই যখন পার্লায়ামেণ্ট চালিয়ে দেশের ও জাতির এত

উন্নতি করতে পেরেছে, তখন আমরা—ভারতবাসীরা কেন স্বায়ত্ত শাসন চালাতে পারব না ?

আর একজন ভারতীয় নেতা লর্ড সিনহা আরও একটা উদাহরণ দিলেন "জালিওনাবাগের" বিষয়ে। তিনি বললেন,—"জালিওনাবাগের" হত্যাকাণ্ডের পর ভারতবাসীরা জেনারেল ডায়ারকে যে কারণে দোষী সাব্যস্ত করে, তার বিচারের জন্য দাবী জানিয়েছিলেন, সেই দাবী তোমাদেরই সব লোক ও সংবাদ পত্র "অবিশ্বাস্য যুক্তিহীন" বলে উড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু পরে যখন সেই বিচারই এই পার্লায়ামেণ্টে হয়েছিল, তখন জেনারেল ডায়ারকে ভারতবাসীদের যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারেই, ঠিক সেই সব কারণেই অভিযুক্ত করে শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো।

যখনই "ডাই-হার্ডরা" কোনও বিষয়ে ভারতবাসীদের স্বায়ত্ত শাসনের অনুপযুক্ত বলে তর্ক করতে আরম্ভ করত, তখনি আমাদের ভারতীয় নেতারা মুখের মত জবাব দিয়ে যাকে বলে "থোতা মুখ ভোঁতা করে" দিতেন। আমি দেখে শুনে গর্বে আত্মহারা হয়ে যেতাম। আমাদের কত যে উৎসাহে ও আশায় সেই সব দিনগুলি কেটে ছিল এত বছর পরে সেটা বুঝিয়ে লেখা অসম্ভব।

একদিন হাউস-অফ-লর্ডের কনফারেন্সের পর "ইণ্ডিয়া-অফিসে" গেলাম। কারণ দিন দুয়েক আগে শুনেছিলাম যে তিন মাস আগে ষাট জন যুদ্ধ-ফেরৎ মিলিটারী অফিসারদের I. F. S.-এ (তখন বলত Imperial Forest Service) নিয়েছে ও আবার বিজ্ঞাপন দিয়েছে আরও কয়েক জনকে নেবে বলে। কেন আরও বেশী অফিসার নেবে জানবার জন্য কৌতূহল হয়েছিল। সেইজন্য সেখানে গেলাম।

আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলাম তখন খুব ভাল দামী পোষাকপরা অভিজাত চেহারার একজন ইংরেজ ভদ্রলোক নেমে আসছিলেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি একজন I. F. S-এর পদপ্রার্থী ?

উত্তরে বললাম—আমার ফরেষ্ট্রীতে এম. এ. পাশের ডিগ্রী আছে কিন্তু শুধু যুদ্ধ ফেরৎ মিলিটারী অফিসারদের নেবে বলে বিজ্ঞাপনে লেখা আছে। সেইজন্য আমি আর দরখাস্ত পাঠাইনি। আমি তো যুদ্ধে যোগ দিইনি। আমাকে কেন নেবে?

তিনি আমার শিক্ষা, আমেরিকাতে নিজের খরচ নিজেই উপার্জন করে লেখা পড়া থাকার কথা সব শুনে বললেন—আমরা উপযুক্ত লোক পাচ্ছি না। তুমি একটা দরখাস্ত পাঠাও, দেখি কি করতে পারি।

তখন জিজ্ঞেস করলাম—আমি কি জানতে পারি আপনার নাম?

তিনি বললেন—আমি সার জন হার্ট, ভারত সরকারের বনবিভাগের 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ ফরেস্টস'। এখন আমি এখানে ছুটীতে আছি।

এই বলে তিনি চলে গেলেন। আমি ওপরে যেয়ে সেই নোটীশ দেখে কেরাণীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে পরের টার্মের কলেজ খোলার আগেই আরও পনেরোজনকে এই চাকরীর জন্য নির্বাচন করবে। দরখাস্ত পাঠানর আর মাত্র ছ দিন বাকী আছে। আমি পরের দিন ভোরেই ট্রেনে রওনা হলাম সার জান হার্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য। সেই কেরানীকেই জিজ্ঞেস করে তাঁর পল্লীভবনের ঠিকানা, 'সারে'তে কোন ষ্টেশনে নামতে হবে সব জেনে নিয়েছিলাম। মনে দ্বিধাও সংকোচ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব কি যাব না ভেবে। মাত্র কয়েক মিনিট সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলার পরিচয়ে সম্পূর্ণ অচেনা অজানা এতবড় একজন ইংরেজ অফিসারকে কেমন করে অনুরোধ করব আমাকে I. F. S. চাকরীর বিষয়ে কোনও সাহায্য করবেন কিনা? আগেই আমি লিখেছি রবিঠাকুরের একটী গান আমার জীবনে একেবারে মন্ত্রের মত কাজ করত। আমি মনে মনে সেই গানটিই গাইলাম—ভাবলে ভাবনা করা চলবে না।

আমি যখন সার জন হার্টের বাড়ীতে পৌঁছলাম, তখন তিনি ব্রেক্‌ফাষ্ট খাচ্ছিলেন। আমাকে একজন মেড এসে ঘরে বসতে বলল।

কিছুক্ষণ পরেই সার জন হার্ট এসে আমাকে বাগানে নিয়ে রৌদ্রে এক গাছের নীচে বসলেন ও সিগারেট খাই কিনা জিজ্ঞেস করলেন। ধন্যবাদ দিয়ে বললাম—আমি সিগারেট খাই না। (চাকরীতে যোগ দিয়ে ভারতে ফেরার পর সিগারেট খেতে সুরু করি। তার আগে কোনও দিন ধূমপান করি নি।)

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,—তিনি কি নির্বাচন কমিটীর একজন সভ্য ?

উত্তরে বললেন যে প্রথমবারের নির্বাচনের সময়ে তিনি একজন "পরামর্শদাতা" ছিলেন। এখন তাঁর ছুটী ফুরিয়ে এসেছে, এক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতে ফিরে যাবেন। বহু আশা করে এসেছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করে সাহায্য পাব। বড়ই হতাশ হলাম।

আমার মুখ দেখে তিনি আমার মনের ভাব বেশ বুঝতে পারলেন। বললেন—তোমার শিক্ষা, কি ভাবে আমেরিকাতে নিজে উপার্জন করে এত বছর পড়ার ও আর সব খরচ চালিয়েছ, সব লিখে দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও। যে "সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্স" ঐ রকম যুদ্ধ ফেরৎ অফিসারদেরই শুধু নেবেন বলে নোটীশ দিয়েছেন, তিনিই ইচ্ছে করলে তোমার বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করে নিয়ম-কানুন একটু অদল-বদল করতে পারেন।

তিনি আমাকে একখানা পরিচয়পত্রও দিলেন ও খুবই ভাল ব্যবহার করলেন। অনেক ধন্যবাদ দিলে, বিদায় নেওয়ার সময় "গেট" পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সেক-হ্যাণ্ড করে 'শুভেচ্ছা' জানালেন।

পরের দিনই সেক্রেটারী অফ ষ্টেট্স মিঃ মণ্টেগুর সাথে দেখা করতে ইণ্ডিয়া-অফিসে গেলাম। কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। উত্তেজনায় নাক, মুখ দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছিল। ভাবনা হচ্ছিল আমার মত একজন সামান্য ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে মিঃ মণ্টেগু—'সেক্রেটারী অফ ষ্টেট্স',—দেখা করবেন কেন ? যদি দেখা করেন তবে কি করব ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই মনে আসছিল।

কয়েক মিনিট পরেই একজন সেক্রেটারী এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,—আমি কেন মিঃ মণ্টেগুর সাথে দেখা করতে চাই ?

আমি যদি বলি কাজের দরখাস্তের জন্য এসেছি, তবে তখনি শুনতে হবে, 'দুঃখিত তিনি এখন দেখা করতে পারবেন না'। সেই ভেবে আমি বুদ্ধি করে বললাম—আমি সার জন হার্টের কাছ হতে এসেছি এবং মিঃ মণ্টেগুর সাথে বিশেষ কারণে দেখা করতে চাই। আমি আগে খবর না দিয়েই এসেছি, তিনি যদি আজ দেখা করতে সময় না পান, আবার কবে আসতে হবে বলে দিলে আমি সেই অনুসারে আসব।

সেক্রেটারী ভেতরে যেয়ে একটু পরেই ফিরে এসে বললেন,—মিঃ মণ্টেগু জেনারেল স্কটের সাথে কথা বলছেন। আপনি দশ পনের মিনিট একটু অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন।

সময় নাকি কারও জন্য অপেক্ষা করে না। কিন্তু মানুষ সময়ের ও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে। একটু পরেই সেই মিলিটারী অফিসারটী বেরিয়ে গেলেন। সেক্রেটারী আমাকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ মণ্টেগুর ঘরের দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে যেতে বললেন। আমি ঘরে ঢুকতেই মিঃ মণ্টেগু এগিয়ে এসে শেকহ্যাণ্ড করে আগুনের সামনের সোফায় বসলেন ও আমাকেও তাঁর পাশে বসতে বললেন। সেদিন ভীষণ শীত ছিল। ঐ যুগে বিলেতে আমেরিকার মত "সেণ্ট্রাল-হিটিং"-এর কোনও বন্দোবস্ত ছিল না।

মিঃ মণ্টেগু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,—আমার জন্য তিনি কি করতে পারেন ? আমি কেন তাঁর কাছে এসেছি ?

আমার তখন মনের অবস্থা সহজেই বুঝতে পারা যায়। সামান্য একজন ভারতীয় ছাত্র আমি সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটস কাছে কাজের চেষ্টায় এসেছি। মিঃ মণ্টেগুর অতি মূল্যবান সময় নষ্ট না করে এক নিঃশ্বাসে আমার কথা, I. F. S.-এর দরখাস্তের বিজ্ঞাপনের বিষয়, সার জন্ হার্ট কি বলেছেন (তাঁর চিঠিও দিলাম) সব বললাম। তা শুনে আমি

কত বছর আমেরিকায় ছিলাম, কোন কোন ষ্টেটে, কোন কোন কলেজে পড়েছি সব বিশদভাবে জিজ্ঞেস করলেন। মিঃ মণ্টেগু বললেন—"ন্যাচারল সায়ান্স" আমেরিকাতেই পড়েছেন ও ঐ দেশে অনেক ঘুরেছেন হাতে-কলমে ঐ বিষয় শেখার জন্য।

আমি সত্যিই আমার জন্মভূমি ভারতের পরেই আমেরিকাকে খুব ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি। কাজেই প্রাণ খুলে প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে ওই দেশের কথা বললাম।

মিঃ মণ্টেগু সব শুনে আমাকে বললেন—তুমি একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও এবং কি উত্তর আসে আমাকে জানিও।

এই সুযোগ পেয়ে বললাম—সার, আমার মত লোকের আপনার সঙ্গে দেখা করা বেশ কঠিন ব্যাপার।

এই শুনে তিনি "বেল্" (Calling Bell) টিপতেই পাশের ঘর থেকে একজন সেক্রেটারী আসতেই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—মিঃ রায় যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তুমি তখনি সে বন্দোবস্ত করে দেবে। দেখো যেন আমার সঙ্গে না দেখা করে ফিরে যায়।

অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিয়ে নীচে পোর্টারের কাছে জানলাম, মিঃ ব্রাউন হচ্ছেন মিঃ মণ্টেগুর প্রধান সেক্রেটারী ও তাঁর নীচে আরও সাত-আটজন জন সেক্রেটারী আছে। সেই দিনই দরখাস্ত টাইপ করে সিলেকসন কমিটীর প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

কেবিন-বয়ের কাজ

আমি J. F. S. চাকরীর দরখাস্ত পাঠানোর আগেই আমেরিকা হতে লণ্ডনে পোঁছে সব জাহাজ কোম্পানীতে ঘুরছিলাম, যদি কোনও সুযোগে বিনা ভাড়ায় ভারতে পোঁছতে পারি, যেমন একবার আলাস্কা হয়ে সিয়াটেল গিয়েছিলাম বিনা ভাড়ায়। আমার

অনেক টাকাও বেঁচে যাবে যদি ফ্রি-প্যাসেজ যোগাড় করতে পারি। কিন্তু কোনও জাহাজ কোম্পানীতেই বিনা ভাড়ায় যাওয়া তো দূরের কথা, ভাড়া দিয়েও একটী "বার্থ" যোগাড় করতে পারলাম না। রোজই যেতাম আর রোজই হতাশ হয়ে ফিরে আসতাম।

আমার চেষ্টার কথা ইণ্ডিয়া-হাউসের ছাত্রমহলে অনেকেই জানত ও নানা বিষয়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করত। একদিন আমি "ইণ্ডিয়া-হাউসে" বসে কাগজ পড়ছি, তখন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এসে মেট্রণের সঙ্গে দেখা করে সেখানে থাকার বন্দোবস্ত করলেন। আলাপ করে জানলাম তিনি কলকাতার ডাক্তার, উচ্চশিক্ষার জন্য একটী ছোট মালের জাহাজের ডাক্তার হয়ে বিলেতে এসেছেন। আরও বললেন, ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন অতি ভাল লোক ও ইণ্ডিয়ানদের খুবই পছন্দ করেন। আমি ঐ ক্যাপ্টেনের ও জাহাজের নাম-ঠিকানা নিয়ে পরের দিন সকালেই টিলবেরী জাহাজ ঘাটে যেয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করে আমার সব "ইতিহাস" বলে, বিনা ভাড়ায় কোনও কাজ নিয়ে ঐ জাহাজে ইণ্ডিয়াতে ফেরার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে জাহাজ একবার বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে পড়লে তিনি সর্বময় কর্তা। কিন্তু কোনও লোককে জাহাজে কাজে নিয়োগ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করলেন ও একটি চিঠি দিয়ে পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানার সব চেয়ে বড় কর্তা সার ম্যাকমাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। ওঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে লণ্ডনে ফিরে এলাম।

পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানীতে ফোন করে জানলাম সার মাইকেল লণ্ডনেই আছেন। দু'তিন দিন পরে ঐ অফিসে গিয়ে আমার কার্ড তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। মিনিট দশের পরেই একজন সেক্রেটারী এসে আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। সার মাইকেল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমার কি দরকার? আমি সেই ছোট মাল জাহাজের ক্যাপ্টেনের চিঠিটা দিয়ে, আমার সব কথা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

বললাম। তাঁর বিরাট চেহারা ও লালমুখ দেখে, আমি বেশ একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল এ যেন সেই রূপকথার দৈত্য ইচ্ছে করলেই আমাকে একটি আঙ্গুল দিয়ে উঠিয়ে নিতে পারে! চিঠি পড়ে বললেন—দিন সাতেকের মধ্যেই উত্তর পাবে। অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

কয়েকদিন পরেই উত্তর এল পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানীর এক জাহাজে আমাকে "কেবিন-বয়"-এর কাজ দিয়ে বম্বে পৌঁছে দেবে। ফ্রি প্যাসেজ পেয়ে দেশে ফেরার আনন্দ ও স্বস্তিতে এত নিশ্চিন্ত হলাম যে, সেইদিনই একটা ভাল রেষ্টুরেণ্টে খুব পেট ভরে খেলাম। জাহাজ ভাড়ার এতগুলি টাকা বেঁচে গেল! এইবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু I. F. S.-এর চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠিয়ে আমার যাকে বলে "হরিষে বিষাদ হলো"। জাহাজ ছাড়ার আর মাত্র চারদিন বাকী আছে। দু'দিন আগেই আমাকে টিলবেরীতে পৌঁছে জাহাজে থেকে কেবিন-বয়ের সব কাজ বুঝে নিতে হবে। এদিকে I. F. S. চাকরীর দরখাস্তের উত্তর আসতে এখনও আট-ন দিন বাকী আছে। এখন কি করি ভাবতে ভাবতে সারা রাত আমার একটুও ঘুম হলো না। সারা জীবনে মাত্র দু'রাত আমি একটুও ঘুমাইনি। প্রথম রাত—যখন 'হাতের লক্ষ্মী ঠেলে ফেলে' অর্থাৎ বিনা ভাড়ায় দেশে যাওয়ার সুযোগ না নিয়ে চাকরীর দরখাস্তের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা ঠিক করলাম। আর এক রাত যখন সেই দরখাস্তের উত্তর এল—তুমি যুদ্ধে যোগ দাওনি, এজন্য তোমার I. F. S. চাকরীর দরখাস্ত ফেরৎ পাঠানো হলো। এই চাকরী শুধু যুদ্ধ ফেরৎ মিলিটারী অফিসারদের জন্য।

যাক্, সেদিন অনেক ভেবে ঠিক করলাম বিনা ভাড়ায় দেশে রওনা হওয়ার সুযোগ না নিয়ে আমার চাকরির দরখাস্তের উত্তরের জন্য লণ্ডনে অপেক্ষা করব। আরও ভাবলাম নিশ্চয়ই আমার অদৃষ্টে অন্য রকম কিছু ঘটবে। নইলে হঠাৎ সার জন হার্টের সঙ্গেই বা কেন দেখা

হবে আর তিনিই বা কেন আমাকে দরখাস্ত পাঠাতে বললেন I F.S চাকরীর নিয়মকানুন সব জেনেও? আমি তো তাঁকে প্রথমেই বলেছিলাম আমি যুদ্ধ ফেরৎ নই।

পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানীর অফিসে যেয়ে প্রেসিডেন্ট সার ম্যাক-মাইকেলের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব খুলে বলে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিনা ভাড়ায় বোম্বে পৌঁছানোর নিয়োগ-পত্র তাঁর সেক্রেটারির কাছে ফেরৎ দিলাম।

সার মাইকেল বেশ একটু বিরক্তই হলেন। বললেন—তুমি যা ভাল মনে করো—তাই করো। কিন্তু আমাকে আর বিরক্ত করতে এস না।

আমি উত্তরে বল্‌লাম—দুর্বলের একটা দাবী আছে মহত্ব ও উদারতার কাছে। যদি এক মাসের মধ্যে আমার এই চাকরী না হয়, তবে আবার তোমার কাছে আসতেই হবে। তিনি এই কথা শুনে "শুভেচ্ছা" জানিয়ে বিদায় দিলেন।

প্রত্যেক দিন অতি আগ্রহের সঙ্গে দরখাস্তের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। ঠিকানা দিয়েছিলাম—ইণ্ডিয়া-হাউস, ক্রমওয়েল রোড। রোজ সকালে বিকালে সেইখানে যেয়ে খোঁজ নিতাম কি জবাব এল? ছ'দিন পরে নির্বাচন কমিটীর সেক্রেটারি উত্তর পাঠালেন —তুমি যে I. F. S. চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছ, সেটা ফেরৎ পাঠালাম। কারণ তুমি যুদ্ধ ফেরৎ মিলিটারী অফিসার নও। দরখাস্তের নিয়ম-কানুন জানবার জন্য তোমাকে ঐ কাজের বিজ্ঞাপনের নকল পাঠালাম।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এত যে আশা এত জল্পনা-কল্পনা সবই মিলিয়ে গেল ঐ "পত্রাঘাতে"! মিঃ মণ্টেগুর কাছে আশাতিরিক্ত ভাল ব্যবহার পেয়েছিলাম। তিনি বলেও ছিলেন যে দরখাস্তের উত্তর এলে যেন তাঁকে জানাই। খুব তাড়াতাড়ি আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার খুবই দরকার। আমি তাঁকে কি বলব তার একটা খসড়া করে লর্ড সিনহার সাথে দেখা করে

সব বললাম। আরও বললাম—ব্রিটীশ সরকার আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের যুদ্ধে নিতে খুবই নারাজ ছিলেন। সেই কারণে যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার জন্য আমরা দায়ী নই। এই অজুহাতে আমাকে "সিভিল সার্ভিস" হতে বঞ্চিত করা কি ন্যায়সঙ্গত হবে?

আগেই লিখেছি যে ভারতের "স্বায়ত্ত শাসনের কনফারেন্সে" তর্ক-বিতর্ক শোনবার জন্য আমি রোজ হাউস অফ্ লর্ডসে যেতাম ও সেখানেই লর্ড সিনহা, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে বেশ পরিচয়ও হয়েছিল। মিঃ মণ্টেগু ও সার জন্ হার্টের সঙ্গে দেখা করার এবং I. F. S.-এ কাজের জন্য দরখাস্ত করা সব শুনে লর্ড সিনহা অবাক হয়ে বললেন—রয়, তুমি গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে উঠে গিয়েছ, এখন আর নীচু ডালের দিকে না তাকিয়ে আবার তুমি মিঃ মণ্টেগুর সাথেই দেখা কর। এই নিয়ম-কানুন তিনি ছাড়া আর কেউ অদল-বদল করতে পারবে না। তবে তিনি যদি তোমার বিষয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেন আমি নিশ্চয়ই তোমার স্বপক্ষে যত দূর সাধ্য বলব।

তাঁর কথায় অনেক ভরসা ও সাহস ফিরে পেলাম। মহা উৎসাহে বাড়ীতে ফিরে এসে সেদিন রাত্রে ভাল করে ঘুমালাম।

পরের দিন ইণ্ডিয়া-অফিসে গিয়ে চীফ-সেক্রেটারী মিঃ ব্রাউনকে বললাম—আমি মিঃ মণ্টেগুর সাথে দেখা করতে চাই।

তিনি কয়েকটী ফাইল নিয়ে মিঃ মণ্টেগুর ঘরে গেলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে বললেন—তুমি যাও, আমি তাঁকে তোমার কথা বলেছি।

মিঃ মণ্টেগুর ঘরে ঢুকে বললাম—আপনার দরকারী কাজের মাঝে বারে বারে এত বিরক্ত করছি এজন্য ক্ষমা করবেন। আপনার কাছে এই I. F. S.-এর চাকরীটা খুবই তুচ্ছ, কিন্তু আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ এর ওপর নির্ভর করছে।

মিঃ মণ্টেগু নিজের দিকে একটী আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন—তুমি জান আমি কে? আমি তাঁর প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে

চুপ করে থাকলাম। তিনি আবার বললেন—আমি ইণ্ডিয়ার সেক্রেটারী। ভারত ও ভারতবাসীর সাহায্য করাই আমার কর্তব্য ও কাজ। তোমার লজ্জিত বা দুঃখিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

মিঃ মণ্টেগু সত্যিই মনে প্রাণে ভারত ও ভারতবাসীদের ভাল বাসতেন। চিরদিন ভারতের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। অতবড় লোকের মুখে ঐ রকম সহানুভূতিভরা কথা শুনে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ইংরেজের দেশে যে এত বড় মহৎ লোক আছেন আমার চাকরীর দরখাস্ত দেওয়ার আগে আমার সে বিষয়ে কোনও ধারণাই ছিল না। আমি তখন তাঁকে এক নিশ্বাসে আমার দরখাস্ত ফিরিয়ে দেওয়ার কথা, কেন আমি যুদ্ধে যোগ দিতে পারিনি সব বললাম।

তিনি সব শুনে বললেন—তুমি ঠিক ঐ ভাবে লিখে আর একটা দরখাস্ত সোজা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বাইরে গিয়ে তখনি আর একটা দরখাস্ত টাইপ করে ফিরে এসে দেখি তিনি একটা মিটিং-এ চলে গেছেন। মিঃ ব্রাউনের কাছে চিঠিটা দিয়ে বললাম—এই চিঠিটা খুবই দরকারী। মিঃ মণ্টেগু ফিরলেই অনুগ্রহ করে তাঁর হাতে এটা দেবেন।

পরের দিন মিঃ ব্রাউনকে ফোন করে জানলাম গতকালই আমার দরখাস্ত তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

ইনটারভিউ

দরখাস্তের উত্তরের অপেক্ষায় আবার দিন গোনা স্নুরু হলো। চারদিন পরে সিলেকসান কমিটীর সেক্রেটারীর কাছে হতে উত্তর এল যে—সোমবার দিন সকাল দশটার সময় ইণ্ডিয়া-অফিসে ঐ কমিটীর সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে। সেইদিনই ইণ্ডিয়া-অফিসে যেয়ে এক জুনিয়ার সেক্রেটারীর কাছে শুনলাম—৩৮২ খানা দরখাস্তের মধ্যে বেছে পঞ্চাশজনকে ইনটারভিউতে ডাকা হয়েছে। তাদের

আবার পরীক্ষা করে মাত্র পনেরজনকে I. F. S.-এ নিযুক্ত করা হবে। মনে মনে ভাবলাম এই সব রথী-মহারথীর সঙ্গে 'প্রতিযোগিতায়' আমার কোনই আশা নেই। একে তো কালা-আদমী, বাঙ্গালী, তাতে আবার মিলিটারী সার্ভিস নেই!

যাক্, সোমবার দিন সকালে 'দুর্গা' বলে ঝুলে পড়লাম। যত দরকারী কাগজ-পত্র সার্টিফিকেট সব একটা ব্যাগে ভরে ইণ্ডিয়া-অফিসে উপস্থিত হলাম। পোর্টার একটা বড় ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল। দশটার আগেই সব পরীক্ষার্থীরা এসে গেল। ঠিক সময়ে বর্ণমালা অনুসারে (Alphabetic) একজনের পর একজনকে ডেকে নিয়ে গেল ইন্টারভিউ দিতে। আমার নাম "R" দিয়ে আরম্ভ। কাজেই আমাকে ডাকার আগে মাত্র দু'জন ছাড়া আর সকলেরই ইন্টারভিউ হয়ে গেল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই সকলকে ছেড়ে দিল। তাদের কি কি প্রশ্ন করেছিল জানতে চাইলে বলল যে বেশী বা কঠিন কিছুই নয়। কেন ইণ্ডিয়াতে যেতে চাই, গরমের দেশে জঙ্গলে কাজ করতে পারবে কিনা, এই সব প্রশ্ন। তারা নাকি কেউ কেউ উত্তর দিয়েছিল—ইণ্ডিয়াতে হাতী বাঘ শিকার করতে, দড়ির ম্যাজিক (Rope-trick) ও রাজা মহারাজাদের দেখতে চায়! দুটী ছেলেকে তখুনি বাতিল করে দিল। একজনের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ও আর একজনের পা খোঁড়া, যুদ্ধে আহত।

অনেক পরে আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকে দেখি একটা গোল টেবিলের মাঝখানে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর দু'পাশে চার জন করে আট জন মেম্বার বসে আছেন। প্রেসিডেন্ট ঠিক সামনেই একটি খালি চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন। প্রেসিডেন্ট আমাকে দু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পর আর সব সভ্যদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের কিছু জিজ্ঞেস করার আছে কিনা জানতে চাইলেন। তাঁরা সকলেই অতি ভদ্রভাবে আমাকে ফরেস্ট্রী, বটানী, সিলভী-কালচার ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

একজন সভ্য জ্জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি আমেরিকায় রাজনৈতিক আন্দোলন করতে ?

আমি বললাম—না।

আর একজন বললেন—তুমি যে সব সার্টিফিকেট দরখাস্তের সঙ্গে পাঠিয়েছিলে, তার একটাতে লেখা ছিল যে তুমি গুড গভর্ণমেণ্ট ক্লাবের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলে।

উত্তরে বলালম—ওতে রাজনীতির কিছুই নেই, শুধু কলেজের শিক্ষার একটী শাখা মাত্র। আমরা সব রকম গভর্নমেণ্টেরই আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক (debating) করতাম। রিপাবলিক, ডেমোক্রেটিক, এমন কি তোমাদের দেশের লেবার, কনসারভেটিভ, লিবারেল পার্টির গভর্নমেণ্ট নিয়ে তর্ক হতো।

আর একজন সভ্য জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি গদর-পার্টির সভ্য ছিলে ?

আমি তো শুনে অবাক বললাম,—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি জানতে চান ? যাক, প্রেসিডেণ্ট থামিয়ে দিলেন, ওই বিষয়ে আর কোনও আলোচনা হলো না। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আবার প্রশ্ন হলো—আমেরিকাতে সবশুদ্ধ কতটা জমিতে 'ফরেষ্ট' আছে ?

একটু হিসাব করে বললাম প্রায় ২৭ ভাগ জমিই 'রিজার্ভ-ফরেষ্ট'। বেশ বুঝতে পারলাম আমাকে জব্দ করার জন্যই এতক্ষণ ধরে নানা রকম প্রশ্ন সভ্যরা জিজ্ঞেস করছিলেন। আর একজন সভ্য জিজ্ঞেস করলেন—তুমি তোমার দরখাস্তে লিখেছ যুদ্ধের সময় আমেরিকাতে এয়ারোপ্লেনের জন্য কাঠ সরবরাহ ও কাঠ শুকনো (Timber supply and drying) করার কাজ করেছ। বলতে পার সবশুদ্ধ কত কিউ বিক ফুট কাঠ লেগেছিল ?

অন্য সব দরখাস্তকারীদের তুলনায় আমাকে এভাবে এতক্ষণ নানারকম জেরা করার জন্য খুবই বিরক্ত লাগছিল। আগেই লিখেছি

আর সকলকেই কয়েক মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল, আর আমার বেলাই যত প্রশ্ন। হঠাৎ আমার তখন আমাদের দেশের সেই 'রাজার সভায় আকাশের তারা গোনার' গল্পটা মনে পড়ে গেল। এক রাজা এক সভাষদ:কে আদেশ দিয়েছিলেন যে আকাশে কত তারা আছে সাত দিনের মধ্যে গুনে বলতে হবে, নইলে গর্দান যাবে! বেচারীর তো গর্দান যাওয়ার আগেই ভয়ে হার্টফেল হওয়ার যোগাড়! তার বুদ্ধিমান বন্ধু পরামর্শ দিল যা মনে আসে বলে দিও। যদি রাজা বিশ্বাস না করেন, তবে তাঁকে গুনে প্রমাণ করতে বোলো। কে আর কবে আকাশের তারা গুনে সঠিক বলতে পারবে? আমিও সেই ভেবে যা মনে এলো চটপট উত্তর দিয়ে দিলাম।

আমার ইনটারভিউ শেষ হয়ে গেল। বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বসলাম। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই বাকী দুজনের ইন্টারভিউ শেষ হয়ে গেল। ফলাফল জানবার জন্য সকলেই চুপচাপ বসে আছি। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রেভেনিউ বিভাগের একজন সেক্রেটারী এসে একটা টাইপকরা কাগজ থেকে যারা ইনটারভিউতে পাস করেছে তাদের নাম পড়তে লাগলেন। আমার "Roy" নাম প্রায় শেষের দিকে। আমি তো নিশ্বাস বন্ধ করে আছি আমার নাম শোনবার জন্য। যখন পড়লেন—"Roy—B. K.", তখন যা আমার মনের অবস্থা, বিশ্বাসই হচ্ছিল না সত্যিই আমি I. F. S-এ মনোনীত হয়েছি। তখনও একটু 'কিন্তু' ছিল। সেটা হচ্ছে মেডিক্যাল পরীক্ষা। যে সব ছেলেরা পাশ করেছে সকলকেই পরের বুধবার মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য সকাল ন'টায় আসতে বলা হলো।

মহা উৎসাহে ও আনন্দে Y. M. C. A-তে ফিরে এসে সকলকেই এই সুখবর দিলাম। সেক্রেটারী ও আর সকলেই খুব খুশি হলেন। ইণ্ডিয়া-হাউসে যেয়ে সেখানেও সব বন্ধুদের বললাম। এই সুদূর বিদেশে সকলের এত আনন্দ ও উৎসাহ দেখে আমার খুবই তৃপ্তি ও ভাল লাগছিল। নিজের আত্মীয়-স্বজনকে আমার সাফল্যের কথা

না বলতে পারার দুঃখটা যেন ভুলেই গেলাম। আমার এক ভাগনেও তখন বিলেতে ইণ্ডিয়া-হাউসে থাকত। সে তো তখনি দেশে মা দাদাদের 'কেবল' করতে বার বার অনুরোধ করল। কিন্তু মেডিক্যাল পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশে খবর দিলাম না। কারণ আমেরিকাতে বেস-বল (Base-Ball) খেলার সময় পড়ে যেয়ে আমার ডান হাতটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখনও কোনও ভারী জিনিষ তুললে হাতে বেশ ব্যথা পেতাম।

বুধবার দিন সকাল ন'টায় ইণ্ডিয়া-অফিসে হাজির হলাম। আর সব মনোনীত ছেলেরাও উপস্থিত ছিল।

আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকে প্রথমেই সমস্ত পোষাক খুলতে হলো। সমস্ত শরীর পরীক্ষার পরে একটা ঝোলানো লোহার ডাণ্ডা দু'হাতে ধরে কয়েকবার ওটা নামা করতে হলো। আমি যদিও দু'হাতেই ডাণ্ডা ধরে ঝুললাম, কিন্তু ডান হাতটা খুবই হালকা ভাবে ছুঁইয়ে রেখে বাঁ হাতেই বেশী ভার দিয়ে কাজ হাসিল করলাম। টেবিলে শুইয়ে প্রত্যেকটি দাঁত ছোট্ট একটি হাতুড়ী দিয়ে ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করা হলো। তারপর চোখ কান সব পরীক্ষা করা হলো। নানা রং-এর উল (Wool) দেখে দেখে বলতে হলো কি রং আছে। আমি 'Colour-Blind' কিনা সেটা জানবার জন্য। সমস্ত পরীক্ষার পর চীফ মেডিক্যাল অফিসার দু'একটি প্রশ্ন করে বললেন—আমি পরীক্ষায় পাশ হয়েছি।

অক্সফোর্ড

পাঁচদিন পরে ডাইরেক্টার অফ ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিস মি. কেসিয়ারের কাছ হতে চিঠি পেলাম যে আমাকে অক্সফোর্ডের কলেজে ভর্তি হয়ে I. F. S-এর পড়া শেষ করতে হবে। কবে যোগ দিতে হবে, কত ফি লাগবে সব জানালেন। আরও জানালেন যে যুদ্ধ-ফেরৎ সব অফিসারদের আগে ভর্তি করে যদি সিট থাকে, তবেই

অন্য লোকদের নেবে। নইলে আমাদের নন্-কলেজিয়েট ছাত্র হয়ে পড়্তে হবে। মনে মনে ভাবলাম—অক্সফোর্ডে কলেজে পড়ার গৌরবটা কিছুতেই হারাব না। এরকম স্বর্ণ-সুযোগ জীবনে আসবে না। সব নদী সমুদ্রই তো পার হয়ে এলাম, এটাই বা বাকী থাকে কেন?

কাজেই কলেজ খোলার এক সপ্তাহ আগেই "অক্সফোর্ডে চলে গেলাম। বেলিয়ান কলেজে প্রফেসর মি. লিডস (তিনি পরে লর্ড উপাধি পেয়েছেন) অনেক চেষ্টা করলেন তাঁর কলেজে আমাকে ভর্তি করতে। শেষ সিনিয়র টিউটার এসে লিষ্ট দেখিয়ে বললেন যে প্রাচ্য দেশের ছাত্রদের নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেছে, কাজেই আমাকে অন্য কলেজে যেতে হবে। মিঃ লিডস নিজেই আরও দু'তিনটি কলেজে ফোন করে শেষে আমাকে পেমব্রোক কলেজে ভর্তি করে দিলেন। সেই কলেজে যেয়ে ফি-এর টাকা জমা দিয়ে সব বন্দোবস্ত করে লণ্ডনে ফিরে এসে সকলকে এই সুসংবাদ দিলাম। তিন চারদিন খুব হৈ-চৈ করে নেমতন্ন খেয়ে ও খাইয়ে অক্সফোর্ডে চলে গেলাম। সেখানে আমার মত ডিগ্রীধারী প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ছাত্রকে একটা কনভোকেসন-এর মত করে অক্সফোর্ডের-এর ছাত্র বলে গ্রহণ করা হলো।

পড়া আরম্ভ হলো। এই বিশ্ববিখ্যাত অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উচ্চ 'আভিজাত্য' আছে। সাধারণতঃ বড় ঘরের ভাল লেখা পড়া জানা ছেলেমেয়েরা এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। প্রতিদিনের পড়াশোনায় যে খুব একটা বিশেষত্ব আছে তা নয়। তবে বাইরের সব বিষয়ের প্রভাব এত বেশী যে লেখাপড়া না করেও যদি কয়েক বছর এইখানে চোখ কান খুলে কাটানো যায়, তবে বিদ্বান না হতে পারলেও "মানুষ" হওয়া যায়।

ফরেষ্ট্রী আমার আগেই পড়া ছিল, আমেরিকাতে ঐ বিষয়ে কলেজের ডিগ্রীও পেয়েছিলাম। অক্সফোর্ড-এর পেমব্রোক্ কলেজের ছয়জন প্রফেসর আমাকে পরীক্ষা করে বললেন যে আমাকে রোজ রোজ ক্লাসে

যেয়ে ফরেষ্ট্রী পড়তে হবে না। তবে ছাত্র হিসেবে শেষ পরীক্ষা দিয়ে পাস করে অক্সফোর্ড হতেও ডিগ্রী নিতে হবে। হাতে-কলমে কাজ শেখার ও দেখার জন্য আর সব ছাত্রদের সাথে ফ্রান্সের ও জার্মানীর ফরেষ্ট-এ যেতে হবে। প্রিন্সিপাল প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকে একটা লিস্ট দিতেন নানা বিষয়ের। আমি সেই বিষয়গুলি পড়ে সব উত্তর লিখে একটা রিপোর্টের মত দিতাম। এ ছাড়া যখন শেষ পরীক্ষা (Final Examination) দিতেই হবে, তখন এদের শিক্ষার ধরণ জানবার জন্য আমি রোজই প্রায় ক্লাসে যেতাম।

প্রিন্সিপাল Sir William Sollick, K, C. I., PH. D., F. R. S., M. A. (Oxon), ছ'মাস আগে রিটায়ার করেছিলেন। তিনি 'ফরেষ্ট্রী' সম্বন্ধে খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর লেখা বই বিলেতে আমেরিকাতে নিউজিল্যাণ্ডে কানাডাতে অষ্ট্রেলিয়াতে ও ভারতে পাঠ্য পুস্তক হিসাবে পড়ানো হতো। তিনি ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিসে অফিসার ছিলেন। বাংলাদেশে ও রিটায়ারের আগে কয়েক বছর দিল্লীতে "I. G. of Forests"-এর কাজ করেছিলেন। একদিন শুনলাম তিনি আমদের ক্লাসে 'লেকচার' দেবেন। আমি ভাবলাম অত বড় একজন পণ্ডিত লোকের ফরেষ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনলে অনেক জ্ঞান হবে। কাজেই ঠিক সময়ে ক্লাসে উপস্থিত হলাম। আমার বরাবর অভ্যেস ছিল স্কুল-কলেজে একেবারে সামনের বেঞ্চে বসা। সেদিনও ঠিক সেইভাবে একেবারে সামনে বসলাম। বক্তৃতায়— "ইকনমিক্স" এর বিষয় আরম্ভ হলো। শুনে তো চক্ষু "চড়ক-গাছ"!

স্যার উইলিয়ামসের বক্তৃতায় শুধু ভারত বিদ্বেষ। আগেই লিখেছি বিলেতে তখন "ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের কনফারেন্সে" স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু কথা কাটাকাটি চলছিল। যে সব ইংরেজরা "লোহিত সাগর" পেরিয়ে ইণ্ডিয়াতে গিয়েছিলেন তাঁরা যত বড়ই হোন না কেন প্রায় সকলেই ভারতের বিরুদ্ধে অনেক অনেক "বিষ" ঢেলেছিলেন ওই কনফারেন্সে যাতে আমরা কিছুতেই স্বায়ত্ত শাসন না পাই। স্যার

উইলিয়ামস অনেক কিছুই বললেন, যেমন ভারতের দুঃখ দারিদ্রের জন্য শুধু ভারতবাসীরাই দায়ী। আমরা অর্থাৎ ইংরেজরা এই সুদূর দেশ হতে অসহ্য গরম দেশে গিয়ে কত কষ্ট কত স্বার্থ ত্যাগ করে অশিক্ষিত অসভ্য ভারতের লোকদের "মানুষ" করার চেষ্টা করছি। যেদিন এরা শিক্ষিত হবে, উন্নতি করবে সব বিষয়ে, সেই দিন আমরা ঐ দেশ হতে চলে আসব, তার আগে নয়। যখন ইণ্ডিয়াতে হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষের সময় জঙ্গলের পাতা বাকল সেদ্ধ করে খেয়ে মরছিল, তখন আমরাই তাদের খেতে দিয়ে বাঁচিয়েছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনে মনে হচ্ছিল যে এতো অক্সফোর্ড কলেজের ক্লাসে ফরেষ্ট্রী বা ইকনমিক্স-এর বক্তৃতা শুনছি না এ যেন 'হাউস অফ লর্ডস'-এ ইণ্ডিয়ার রিফর্ম সম্বন্ধে ইংরেজের বিদ্বেষ ভরা যুক্তি শুনছি। আমার তো রক্ত গরম হয়ে মাথা ফেটে যাওয়ার যোগাড়। আমিই একমাত্র ভারতবাসী ছিলাম ক্লাসে। মনে হচ্ছিল সব ছাত্ররাই আমার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছে। আমি ভারত সম্বন্ধে এই বিষয়ে স্যার রমেশ দত্তের, মেজর বোসের, ডাঃ সাদারল্যাণ্ডের, স্যার ডিগবীর লেখা সব বই পড়েছিলাম। তাছাড়া নিজেও ইকনমিক্স নিয়ে আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. ডিগ্রী পেয়েছি। আমি ছাড়া সব ছাত্ররাই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য হাই-স্কুলের পড়ার বেশী পড়েনি। আমিই একমাত্র ছাত্র যে তাদের দেশের ও জাতির জন্য যুদ্ধও করেনি। এই সব কারণে আমাকে তারা দুচক্ষে দেখতে পারত না, কেমন যেন হিংসের ও অবজ্ঞার ভাব ছিল।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—এক্সকিউজ মি স্যার, আপনি যা বলছেন সব ভুল। স্যার উইলিয়ামস কানে একটু কম শুনতেন। কানে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি বলছ?

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই ছেলেরা বলে উঠল—রয় বলছে আপনার বক্তৃতা সব ভুল।

তাদের তো মহা আনন্দ। এইবার আমাকে বাগে পেয়েছে।

স্যার উইলিয়ামসের মত বিখ্যাত উপাধিধারী লোকের মুখের ওপর তাঁর বক্তৃতার ভুল ধরা ! কি আস্পর্ধা ! আমার যতদূর সাধ্য বুঝিয়ে বললাম আমাদের দেশের সভ্যতা, শিক্ষা, ব্যবসা, বানিজ্য, শিল্প-কলা কত পুরাতন ও পৃথিবী বিখ্যাত ছিল, যখন রোম পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছিল, তখন এই ভারতের তৈরী জাহাজে ভুবনবিখ্যাত মসলিন সিল্ক সোনা রূপা ও হাতীর দাঁতের তৈরী অতি সুন্দর সুন্দর জিনিস সেই সব দেশে চালান যেত। এমন কি পৃথিবী বিখ্যাত সুন্দরী রাণী ক্লিওপেট্রার অঙ্গেও ভারতের সিল্ক ও মসলিনের তৈরী পোষাক শোভা পেত। শিক্ষায় সভ্যতায় বাণিজ্যে কারুকার্যে ভারতের স্থান অনেক উচ্চে ছিল। আজ তোমাদের শাসনের ও শোষণের দোষে ভারত আস্তে আস্তে এত নীচে ও দারিদ্রের মাঝে নেমেছে। এই দুর্দশার জন্য দায়ী হচ্ছ তোমরা—ইংরেজরা। তোমাদের কুশাসনের ও শোষণের জন্য যখন হাজার হাজার লোক অনাহারে মরছে তখন কিছু খাদ্য দিয়ে সাহায্য করাকে এত বাহাদুরী মনে করছ কেন ?

আমার তখন যেন কোনও জ্ঞান ছিল না। মনে হচ্ছিল একটা ঘুসি মেরে স্যার উইলিয়ামসের মুখটা জখম করে দিই এই সব মিথ্যা ও অহঙ্কারের কথা বলার জন্য। ভুলেই গিয়েছিলাম আমি একজন ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিসের উচ্চ অফিসার, ব্রিটিশ সরকারের খাস প্রজা। ভুলেই গিয়েছিলাম আমার এখন "প্রবেসন" (probation) চলছে। কিছু গোলমাল করলে কলমের একটি খোঁচায় আমার চাকরীর দফা-রফা হবে, আবার যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ব। যাক্, সমস্ত ক্লাসে যাকে বলে "Pin-drop silence" সেই রকম হলো। স্যার উইলিয়ামস আমার দিকে এক রকম অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থেকে হাতের বই বন্ধ করে 'আজকের মত ক্লাস বন্ধ' বলেই গট গট করে রাগে অপমানে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। সামান্য একজন কালা-আদমী "প্রবেসনে" আছে, সে কিনা ব্রিটিশ সিংহের লেজ মোচড়াল ? এর শোধ নিতেই হবে। আমিও আস্তে আস্তে খাতা পত্র গুছিয়ে চলে

এলাম নিজের ঘরে। কারও সঙ্গে কথা বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছিল না। অবশ্য ঐ সব ছাত্ররাও আমার সঙ্গে কথা বলল না। সকলেরই রাগ কেন আমি ঐ রকম কড়া জবাব দিলাম।

সেক্রেটারী অফ স্টেটস-এর তলব

কয়েকদিন পরে ইণ্ডিয়া অফিস হতে এক চিঠি এল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যেন সেক্রেটারী অফ স্টেটস-এর সাথে দেখা করি। কলেজের ছুটি ভিন্ন কোনও ছাত্র অক্সফোর্ড ছেড়ে বাইরে যেতে পারে না। কাজেই সেই চিঠি নিয়ে সিনিয়র প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করে অনুমতি নিয়ে লণ্ডনে গেলাম।

সেইদিনই ইণ্ডিয়া অফিসে যেয়ে মিঃ ব্রাউনকে চিঠিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আমাকে কেন ডেকেছেন ?

মিঃ ব্রাউন বললেন—আমিও ঠিক জানি না, তবে তোমার সম্বন্ধে অক্সফোর্ড হতে মিঃ মণ্টেগুর কাছে একটা চিঠি এসেছে।

আধঘণ্টা পরেই আমাকে তার কাছে নিয়ে গেলেন। মিঃ মণ্টেগু আমি ঘরে ঢুক্‌তেই এগিয়ে এসে "সেক-হ্যাণ্ড" করে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন—রয়, তোমার সঙ্গে স্যার সিলিকের কি গোলমাল হয়েছিল ? এই দেখ তোমার বিরুদ্ধে তিনি কি চিঠি লিখেছেন।

পড়ে দেখলাম চিঠিতে লেখা আছে—"এই ছেলেটি অত্যন্ত ইংরেজ-বিদ্বেষী, একে অবিলম্বে "শিক্ষানবিশী" (probation) হতে বরখাস্ত করা উচিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তখন তাঁকে সব খুলে বল্‌লাম। আরও বললাম—আমিই একমাত্র ভারতবাসী ছিলাম ঐ ক্লাসে। সমস্ত ছাত্রদের সামনে আমার দেশ ও দেশবাসীদের সম্বন্ধে ঐরকম আলোচনা শুনে আমার অত্যন্ত অপমান বোধ হচ্ছিল। কাজেই যেটা সত্যি সেটাই আমি স্যার সিলিককে বলেছিলাম।

মিঃ মণ্টেগু আমার প্রত্যেকটি কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে বল্‌লেন—"রয়, তুমি যা বলেছ সত্য হতে পারে, কিন্তু কিন্তু ভুলে যেও

না যে তুমি এখন ইংরেজ গভর্নমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। তুমি সেই গভর্নমেণ্টের প্রশংসা না করতে পার, কিন্তু নিন্দে করাটা মোটেই ভাল দেখায় না। তুমি সরকারী নিয়ম-কানুনগুলির প্রতি আনুগত্যের কথা মনে রেখ। আশা করি তুমি আমার এই উপদেশ ভুলবে না।

তারপর আমার অক্সফোর্ড কেমন লাগছে তাও জিজ্ঞেস করলেন। আমি কত চেষ্টা করে অক্সফোর্ডের কলেজে ভর্তি হতে পেরেছি এবং জীবনের একটা মস্ত বড় আকাঙ্ক্ষা সফল হয়েছে, খুবই আনন্দে ও উৎসাহে দিন কাটছে বললাম। মিঃ মণ্টেগু সব শুনে খুবই খুসী হলেন। সেক-হ্যাণ্ড করে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় দিলেন। বিলেতে যেমন স্যার সিলিকের মত ভারতবিদ্বেষী লোক আছে, তেমনি মিঃ মণ্টেগুর মত অতি মহৎ ও উদার লোকও আছেন। এই ঘটনা তখনকার যুগে ইণ্ডিয়াতে ঘটলে আমাকে সরাসরি "শ্রীঘরে" বাস করতে হতো! বিলেতে মিঃ মণ্টেগুর মত উদার হৃদয় মানুষের জন্য আমি এত সহজে রেহাই পেলাম!

ডেপুটি ডিরেকটার অফ এগ্রিকালচার

একদিন কলেজের নোটিশ বোর্ডে পড়লাম যে আটচল্লিশ জন ডেপুটী ডিরেকটার অফ এগ্রিকালচার নিযুক্ত করা হবে। কলেজের প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞেস করলাম—আমাকে কি ঐ চাকরীতে নেবে I. F. S. বদল করে? কারণ ঐ কাজের বিজ্ঞাপনে যেরকম শিক্ষা ও যোগ্যতার দরকার লেখা ছিল, আমার সে সব ডিগ্রী ও শিক্ষা সবই ছিল।

প্রিন্সিপাল আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। বললেন—নিশ্চয়ই নেবে। তুমি চাকরীর দরখাস্ত কর। আমি I. F. S-এর বদলে তোমাকে I. A. S-এ (Indian Agriculture Service) অনায়াসে বদলি করে দিতে পারব।

আমার এক ভাগনে কলকাতায় ডেপুটী ডাইরেকটার অফ এগ্রিকালচার ছিল। যে দিদির কাছে আমি খুলনায় ও গৈলায় পড়াশোনা করেছিলাম তাঁরই ছেলে এই ভাগনে। তার কাছে বাংলাদেশের কৃষি-বিভাগের অফিসারদের কাজকর্মের কথা, তাদের বাড়ী-ঘর, মোটর, মাথায় পাগড়ী বাঁধা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো কোট পরা চাপরাসী, অফিসের মর্যাদা ও সেলাম পাওয়া দেখে খুবই ইচ্ছে হতো এরকম যদি একটা চাকরী আমি পেতাম! আমাদের দেশে "ফরেষ্টের" চাকরীর বিষয়ে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। একবার পাঁচ বছর আমেরিকায় থাকার পর মাকে দেখতে দেশে ফিরেছিলাম। আমিই তাঁর সকলের ছোট সন্তান। এত বছর আমাকে না দেখতে পেয়ে আমার মা বড়ই কান্নাকাটী করতেন। বয়সও তাঁর অনেক হয়েছিল। তখন আমার ঐ ভাগনেই আমাকে বার বার বলেছিল—ছোটমামা, আবার কেন অতদূরে আমেরিকায় ফিরে যাবে? আমার কৃষিবিভাগেই একটা কাজে যোগ দাও। আমি ও ঐ ভাগনে প্রায় একবয়সী ছিলাম। খুলনা ও গৈলা স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছি। মামা ভাগনে সম্পর্ক ছাড়াও আমরা দুজনে খুবই বন্ধু ছিলাম। কিন্তু তখনও আমায় লেখাপড়ার অনেক বাকী ছিল। সব ডিগ্রীগুলি ইউনিভার্সিটি হতে পাওয়া যায়নি। আমেরিকাতে ফিরে যাব ঠিক করেই দেশে এসেছিলাম মাকে দেখতে। কাজেই আবার ফিরে গিয়েছিলাম সেখানে।

প্রিন্সিপালের কথা শুনে আমার আর আনন্দ ও উৎসাহের সীমা নেই। তাঁর চিঠি নিয়ে লণ্ডনে এসে কৃষি-বিভাগের চীফ-সেক্রেটারী স্যার কারসো-এর সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন—তোমাকে আমরা নিশ্চয়ই কৃষি-বিভাগে নিতে পারি, কিন্তু তুমি I. F. S-এ 'ওভার-সীজস' মাইনে বেশী পাচ্ছ, সেটা I. A. S-এ পাবে না। এ বছর হতে কৃষি বিভাগের কোনও নুতন ভারতীয় কর্মচারীদের 'ওভার-সীজস' দেওয়া হবে না।

অতগুলি অতিরিক্ত মাইনের টাকা হারাতে ইচ্ছে হলো না। কাজেই পরের দিন আবার অক্সফোর্ডে ফরেষ্ট কলেজে ফিরে গেলাম। বছরের শেষে ফ্রান্স ও জার্মানিতে অনেক "ফরেষ্ট" দেখে ওয়ার্কিং প্ল্যান তৈরী করা শিখে অক্সফোর্ডে ফিরে এলাম। ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম ও সসম্মানে পাশ করলাম। যারা পাশ করেছে তাদের নামের তালিকাটি পড়ে ডিরেক্টার অফ ফরেষ্ট বললেন যে, পাশ করা ছেলেদের পাসপোর্ট ইত্যাদি যোগাড় হলেই আমাদের সকলকে ইণ্ডিয়াতে রওনা হতে হবে। আমরা যেন সেইভাবে প্রস্তুত থাকি।

আমাকে নিয়ে সবশুদ্ধ একুশজন ছেলেকে ইণ্ডিয়াতে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত করা হলো। অক্সফোর্ড কলেজে ভর্তি হওয়ার সময়ে সব ছাত্রকেই একশো পাউণ্ড বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল। নিয়মাবলীতে লেখা ছিল যে যদি কোনও ছাত্র দু'বছরের আগেই পড়া শেষ করে পাশ করতে পারে তবে তাকে আরও বেশী বৃত্তি দেওয়া হবে। আমি ডিরেক্টর অফ ফরেষ্ট-এর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করলাম,—'আমি তো দু'বছরের আগেই পাশ করেছি, আমাকে কি অতিরিক্ত বৃত্তি দেওয়া হবে?

তিনি বললেন—তুমি যেদিন ইণ্ডিয়াতে পৌছবে, সেদিন হতেই ওভার-সীজস পে শুদ্ধ সমস্ত মাইনে এক সঙ্গে পাবে। কাজেই এখন আর বিশেষ বৃত্তির কোনও প্রশ্নই ওঠেনা।

শুনে আমি আর কিছু বললাম না। আমাকে মাদ্রাজে পোষ্ট করা হয়েছে জেনে আপত্তি করলাম। কারণ এত বছর বিদেশে ছিলাম, বাংলা দেশ ছেড়ে সারাজীবন মাদ্রাজে কাটাতে ইচ্ছে ছিল না। ডিরেক্টার বললেন—মাদ্রাজে দুজন আমেরিকান ফরেষ্ট অফিসারকে অনেক টাকা বেশী মাইনে দিয়ে তিন বছরের জন্য ফরেষ্ট-বিভাগে নিযুক্ত করা হয়েছে। তুমি আমেরিকায় ছিলে ও সেখানকার কলেজেই ফরেষ্ট্রী পাশ করেছ, ওদের কাজের ধরণ বুঝতে পারবে ও সাহায্যও করতে পারবে। সেই জন্যই তোমাকে মাদ্রাজে পোষ্ট করা হয়েছে।

কি আর করব! 'Beggers can't be choosers' ভেবে চুপ করে গেলাম।

আমি অক্সফোর্ড ছেড়ে লণ্ডনে ফিরে ইণ্ডিয়া-হাউসে উঠলাম। প্যাসেজ ইত্যাদি 'সেক্রেটারী অফ ষ্টেটস' সব ঠিক করে দেবেন। তবে যদি কোনও ছেলে নিজের চেষ্টায় তাড়াতাড়ি প্যাসেজ পাসপোর্ট যোগাড় করে ইণ্ডিয়াতে ফিরে যেতে পারে, তাতে তাদের কোন আপত্তি নেই। পুরানো ছেলেরা সাত দিনের বেশী ইণ্ডিয়া-হাউসে থাকতে পারে না। কাজেই আমি বাইরে একটা ঘর খুঁজতে লাগলাম থাকবার জন্য। আমার বন্ধু জোৎস্না দে তখন পড়া শেষ করে লণ্ডনে আর তিনজন বন্ধুর সঙ্গে একটি বাড়ী ভাড়া করে একসঙ্গে থাকত। আমাকেও তাদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করল। আমার টাকা ফুরিয়ে আসছিল, জাহাজের জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে জানি না। খুব খুশি হয়ে ওদের সঙ্গে থাকতে স্বীকার করলাম। এক বাড়ীতে একসঙ্গে খাওয়া থাকাতে আমার খরচ অনেক অল্প টাকায় কুলিয়ে গেল। ইণ্ডিয়া-হাউসের খরচ অনেক বেশী ছিল।

তিন-চার সপ্তাহ পরে একদিন জোৎস্না দে বলল—রয়, তোমার কি ছোট জাহাজে ইণ্ডিয়াতে ফিরতে আপত্তি আছে? যদি না থাকে, তবে একটা প্যাসেজ পেতে পার।

জোৎস্না দে ভেবেছিল যে এবার তো জাহাজ ভাড়া আমার নিজের পকেট হতে দিতে হবে না, তাই যত খরচই লাগুক না কেন সবচেয়ে ভাল জাহাজে ফার্ষ্ট ক্লাসে আমি যাব নবাবী ষ্টাইলে।

ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করাতে বলল—কুচবিহারের মহারানীর শরীর অসুস্থ থাকায় বিলেতে আসবার সময় নিজের পরিবারের ডাক্তারকে সমস্ত খরচ দিয়ে সঙ্গে এনেছিলেন। ডাক্তার ইণ্ডিয়াতে ফিরে যাওয়ার জন্য ছোট একটা জাহাজে প্যাসেজ পেয়েছিল। এখন সে পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানীর একটা মস্ত বড় জাহাজেও কেবিন পেয়েছে। খরচ তো সবই কুচবিহারের মহারানীর, যাকে বলে 'লাগে টাকা

দেবে গৌরী সেন', কাজেই ওই ডাক্তার ছোট জাহাজের প্যাসেজ ছেড়ে দিচ্ছে।

আমি জ্যোৎস্না দেকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে তখুনি ওই ডাক্তারকে ফোন করে সেই প্যাসেজটি নিজের জন্য নিলাম। ডিরেক্টারকে জানালাম —S. S. China জাহাজে প্যাসেজ পেয়েছি। আমার টিকিটের টাকাটা যেন পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানীতে শিগগিরই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই জাহাজ ছাড়বে।

দু'দিন পরেই ইণ্ডিয়া-অফিসে যেয়ে চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি একটা ফর্ম দিয়ে সেটা সম্পূর্ণ করে লিখতে বললেন। সেই কাগজে নাম ধাম ধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ে লিখতে হয়েছিল। "Nationality"-এর জায়গায় লিখলাম "ইণ্ডিয়ান"। "Race"-এর জায়গায় লিখলাম—"Aryan" (আর্য)। উনি ফর্মটা পড়ে বললেন—তুমি ভারতবাসী, কিন্তু কোন প্রদেশ হতে এসেছ সেটাই লেখা উচিত ছিল।

আমি বললাম—"Nationality" বলতে যা বোঝায় তাই লিখেছি।

আমার মাতৃভাষা কি জিজ্ঞেস করাতে বললাম যে, বাংলা। তখন তিনি নিজেই "Nationality"-এর জায়গায় "বাঙ্গালী" লিখলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এইবার ঠিক লিখেছি, কি বল?

আমি উত্তর দিলাম—আমার ইচ্ছে নয় যে ভারতবাসীর মধ্যেও আমি আলাদা এটা মনে করি। যেমন বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মারাঠী, গুজরাটী ইত্যাদি জাতিতে বিভক্ত।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি একেবারে খাঁটি আর্য?

উত্তর দিলাম—না, একেবারে খাঁটি আর্য এখন কোথাও নেই। সব মিশে গেছে অনেক জাতির রক্তের সঙ্গে।

আমার সঙ্গে আর তর্ক না করে ধর্মের জায়গায় লিখলেন, হিন্দু।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম অনেক বছর আমেরিকায় ও বিলেতে

আছি। ইণ্ডিয়াতে ফিরে মাদ্রাজে কাজে যোগ দেওয়ার আগে ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে মা দাদাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি কিনা ?

বললেন—এখান থেকে আমরা ছুটি মঞ্জুর করতে পারি না। তবে তুমি বম্বে পৌঁছে গভর্নমেণ্টকে জানালে বোধহয় ছুটি পেতে কষ্ট হবে না।

মিঃ মণ্টেগুর সাথে দেখা করে অনেক ধন্যবাদ ও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। তিনি আমাকে "শুভেচ্ছা" জানিয়ে আবারও বললেন—রয়, মনে রেখো তুমি এখন একজন উচ্চপদস্থ গভর্নমেণ্ট অফিসার।

তারপর লর্ড সিনহার সঙ্গে দেখা করলাম তিনি বললেন—সাবাস ছেলে, একটা কাজের মত কাজ করলে বটে! আশা করি তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ এই রকম উজ্জ্বল ও সফল হবে।

সিলেকশন কমিটির প্রেসিডেণ্ট স্যার সেপার্ডের সাথেও দেখা করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে সব ঠিক আছে কিনা। নিজের চেষ্টায় প্যাসেজ যোগাড় করে আর সব ছেলেদের চেয়ে দু'মাস আগেই ইণ্ডিয়াতে পৌঁছাব ও সেই স্পেশাল স্কলারশিপের কথাটাও তাঁকে জানালাম, ডিরেক্টার বৃত্তি সম্বন্ধে কি বলেছেন তাও বললাম। তিনি শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় দিলেন।

পরের দিন ইণ্ডিয়া হাউসে ফোন এল যে কাউন্সিল আমাকে সেই 'বিশেষ বৃত্তি' একশো পাউণ্ড মঞ্জুর করেছে। আমি নিজেই টাকাটা নিতে আসব না, ওঁরাই পাঠিয়ে দেবেন ?

উত্তরে বললাম যে আধ ঘণ্টার মধ্যেই নিজে আসছি টাকা নিতে। ঠিক রওনা হওয়ার আগেই অতগুলি টাকা এক সঙ্গে পেয়ে আমার আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল হয়ে গেল। নইলে যা টানাটানি করে দিন কাটাচ্ছিলাম। বাড়ীতে ফিরে সব বন্ধুদের খাওয়ার নেমতন্ন করলাম। জোৎস্না দে খুব ভাল রাঁধতে পারত। সেই ফর্দ করে জিনিস পত্র কিনে মহাউৎসাহে বাঙ্গালী ধরনের রান্না করল। আমরা

সকলে তাকে সাহায্য করলাম। খুব আনন্দ করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হলো।

আমি এত বছর আমেরিকা বিলেতে থেকেও নাচ গান সিগারেট মদ খাওয়া কিছুই করিনি। সেই জন্য জোৎস্না দে ও আর সকল বন্ধুরাও আমাকে "প্রফেসার" বলে ডাকত। আমাকে সকলে মিলে একটা কুমীরের চামড়ার সুন্দর ব্যাগ উপহার দিল। ঐ সুদূর বিদেশে সকলের কাছ হতে ভালবাসা স্নেহ আদর যত্ন এত অজস্র পেয়েছি যে আজও এই বুড়ো বয়সে ভাবতে গেলে চোখে জল আসে।

প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া

রওনা হওয়ার আগের দিন স্যার কারসোকে "গুড-বাই" বলতে ইণ্ডিয়া অফিসে গেলাম। তিনি বললেন যে আমার চাকরীর কাগজ পত্র সব ভারতে পাঠান হয়েছে। পাসপোর্ট ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞেস করাতে বললাম যে 'পাসপোর্ট' করিনি। গভর্নমেণ্টই সব করবে তাই ভেবেছি।

উনি বললেন পাসপোর্টের জন্য তাঁদের কোনও দায়িত্ব নেই। আমাকে বাইরে এনে সেণ্ট জেমস পার্কের কাছে একটি বাড়ী দেখিয়ে বললেন—ওইখানে পাসপোর্টের অফিস আছে। তুমি এখনি ওখানে গিয়ে পাসপোর্ট যোগাড় কর। নইলে কাল সকালে তোমাকে জাহাজে রওনা হতেই দেবে না।

কি ভাগ্যি আমার কাগজপত্রের ব্যাগের ভেতরে ছোট একটি ফটো ছিল। তখুনি পাসপোর্ট অফিসে যেয়ে সাইন-বোর্ড দেখে সোজা ওপরের দোতালার ঘরে নক করে ঢুকলাম। আমাকে দেখে অফিসারটি একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন, জিজ্ঞেস করলেন আমি কে, কি দরকারে এসেছি, কে পাঠিয়েছে, কতদিন বিলেতে আছি, ইত্যাদি।

উত্তর দিলাম—দু'বছর বিলেতে আছি। এর আগে অনেক বছর আমেরিকায় কলেজে পড়েছি।

ওঃ, তাই এখন বুঝতে পারলাম—বলে অফিসারটি দরজার বাইরে একটা বেঞ্চে কয়েকজন বসে আছে তা আমাকে দেখিয়ে বললেন—দেখেছ, ওরা সকলেই পাসপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকেই পালা ক্রমে এক একজন করে এসে পাসপোর্ট নিয়ে যাবে।

আমি চিরদিনই ভীষণ অন্যমনস্ক। এতক্ষণে খেয়াল হলো একেবারে সোজা ঘরে না ঢুকে বাইরে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। বিলেতে যেমন আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুন, পরিচয়ের (Introduction) কড়া-কড়ি, আমেরিকায় তেমনি ঐ সবের কোনও বালাই নেই, সবই খুব সহজ ও সরল ব্যবস্থা। পরিচয় না করিয়ে দিলেও সকলেই সকলের সঙ্গে কথা বলে। একে তো আমি খুবই অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক, তার ওপর এত বছর আমেরিকাতে থাকাতে সোজা ঘরে ঢুকে কথা বলা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। যাক্, অফিসারটি আমাকে বসতে বলে আমেরিকার বিষয়ে অনেক জিজ্ঞেস করলেন। আমেরিকার সাহায্যে যুদ্ধ জয়ের পরে বিলেতের লোকজন আমেরিকা সম্বন্ধে জানবার জন্য খুবই উৎসুক ছিল ওই সময়ে। আরও জিজ্ঞেস করলেন আমেরিকায় অত বছর কাটিয়ে এখন বিলেতে কেমন লাগছে ?

আমি বিলেতের ইংরেজদের, বিশেষতঃ মিঃ মণ্টেগুর, খুবই প্রশংসা করে বললাম—নিজেদের দেশে ইংরেজরা এত ভদ্র ও ভাল, কিন্তু আমাদের দেশে পৌঁছলেই অমন বদলে যায় কেন ? বোধহয় যত মহৎ ও সদ্ গুণগুলি 'রেড সী' তে ডুবিয়ে দিয়ে ইণ্ডিয়াতে উপস্থিত হয়।

উনি হেসে বললেন—না, বোধহয় এখানে কোল্ড-স্টোরেজে রেখে যায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার হাতে পাসপোর্ট দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় দিলেন। এই ভদ্রলোকের নাম মিঃ স্কট, একজন অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস।

পরের দিন সকাল আটটার মধ্যেই জাহাজে উঠলাম। দুপুরের খাওয়ার আগেই জাহাজ ছাড়ল। তিন সপ্তাহ পরে বম্বে পৌঁছেই

চীফ-সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে হবে ও ছুটির কথা বলতে হবে। মহা উৎসাহ ও আনন্দে জাহাজে দিন কাটছিল। আবার ভাবনাও হচ্ছিল কারণ ইংরেজরা আমেরিকান সভ্যতা আদব-কায়দা কলেজের ডিগ্রী কিছুই পছন্দ করে না। বিশেষতঃ আমেরিকার সাহায্যে ও যোগদানে যুদ্ধ জেতার পর হতে।

ওই যুগে মাদ্রাজের বন-বিভাগের সব উচ্চ কর্মচারীরাই ইংরেজ ছিল, শুধু তিনজন ভারতীয় ছাড়া। তাঁদের মধ্যে দু'জন পার্শী ও একজন মারাঠী ছিলেন। আমিই প্রথম বাঙ্গালী আই. এফ. এস। আমার মাত্র দু'বছর বিলাতে ও অক্সফোর্ড কলেজে শিক্ষা ছাড়া সবই আমেরিকার—বিদ্যা, আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন। চাকরীর জীবনে কি রকম ব্যবহার পাব তাই ভাবছিলাম।

আমেরিকায় থাকতে মাইশোর গভর্নমেণ্ট নিউইয়র্কের শিক্ষা বিভাগকে লেখে যে তারা কেমন করে তাদের ছোট ছোট নদী ও ঝর্ণা হতে বিদ্যুৎ তৈরী করে তার একটা বিবরণী পাঠাতে। শিক্ষা-বিভাগ হতে ঐ চিঠিটা "ষ্টেট্ ফরেষ্ট কলেজের" ডীনকে পাঠিয়েছিল। আমি তখন ঐ কলেজে ছিলাম। ডীন আমাকে ডেকে ঐ চিঠিটা দিয়ে বলেছিলেন—রয়, তোমার দেশ ভারত থেকে এই চিঠিটা এসেছে। তুমিই এই চিঠির রিপোর্টটা লেখ।

তিনি এ সম্বন্ধে যাঁরা বিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন তাঁদের কাছে আমার পরিচয় পত্র দিলেন। আমি X-mas-এর ছুটির সঙ্গে আরও এক সপ্তাহের বেশী ছুটি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে ঐ সব জায়গা ঘুরে, সব দেখে ও শুনে রিপোর্ট লিখে পাঠালাম। প্রায় তিনমাস পরে মাইশোর গভর্নমেণ্টের কৃষি-বিভাগের প্রধান মিঃ কোলম্যান (Mr. Coleman) আমার রিপোর্টের খুব প্রশংসা করে আমাকে অনুরোধ করলেন যে যদি কখনও আমি ভবিষ্যতে ভারতে ফিরে চাকরী করতে চাই, তবে যেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা না করে অন্য কোথাও চাকরী না নিই। মিসেস সরোজিনী নাইডুও আমাকে হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী সার আলী

ইমামের কাছে খুব ভাল প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। সিন্ধের এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মিঃ ফারুকীও সার আলী ইমামকে চিঠি দিলেন আমার কাজের জন্য। তাঁরা দুজনেই খুব বন্ধু ছিলেন ও একসঙ্গে ব্যারিস্টারী পড়ে ছিলেন। এইভাবে অনেক প্রশংসা-পত্র যোগাড় করে ছিলাম যদি ভবিষ্যতে দরকার হয় ভেবে।

বম্বে পৌঁছে বিলাতের ইণ্ডিয়া-অফিসের উপদেশ অনুসারে চীফ-সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করলাম। কিছুক্ষণ কথা বলার পর একজন কেরানী তিনখানা খাতা নিয়ে এল ও চীফ-সেক্রেটারী ঐ সব খাতায় সই করতে বললেন। তারপর একটা টেবিলের টানা-দেরাজ খুলে গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার সিল-মোহর করা বড় একটা এনভেলাপ আমার হাতে দিলেন। ঠিকানায় লেখা ছিল—"B. K. Roy Esqr., I. F. S., Madras". নিজের নাম ও ঠিকানা জীবনে প্রথম ঐ ভাবে ছাপার অক্ষরে দেখে আমার চোখ তো আনন্দে ও গর্বে প্রায় রসগোল্লার মত গোল হয়ে উঠলো। ঔৎসুক্যের সঙ্গে চিঠি খুলে পড়ে দেখি যে আমাকে কলকাতা যাওয়ার জন্য ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে, কিন্তু কতদিনের জন্য সে সব কিছুই জানায়নি। চীফ-সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করতে বললেন—তুমি এক কাজ কর। কলকাতায় পৌঁছে মাদ্রাজের চীফ কন্‌সারভেটার অফ ফরেস্টকে চিঠি লিখে ছুটির বিষয়ে জেনে নিও!

সেইভাবে কলকাতা হতে চিঠি লিখলাম ও উত্তর পেলাম যে এক মাসের ছুটির পরে মাদ্রাজে কাজে যোগ দিতে। সেইসঙ্গে দশ'ই জানুয়ারী বম্বেতে রিপোর্ট করার দিন হতে দশ'ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এক মাসের পুরো মাইনেও মঞ্জুর করলেন।

লিখে বোঝাতে পারব না এত বছর আমেরিকায়, বিলেতের অক্সফোর্ডে থেকে লেখাপড়া করে ডিগ্রি নিয়ে এত বড় চাকরী নিয়ে (তখনকার দিনে—১৯২০ সালে,—I.F.S চাকরী খুবই সম্মানের ও বড় চাকরী ছিল) কলকাতায় আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের অজস্র ভালবাসা

স্নেহ সম্মান অভিনন্দন নিয়ে আমার সেই ছোট্ট গ্রাম কুলকাঠীতে ফিরে আসা কত আনন্দের ও গৌরবের।

আমার জীবনে 'বড়' হওয়ার জন্য কঠোর সংগ্রামের অধ্যায় এইখানে শেষ হলো। এই পৃথিবীর অনেক বড় বড় মানুষের জীবনের তুলনায় আমার জীবন যত সামান্যই হোক না কেন, এটা লেখার বাসনা আমার মনে জাগল এই ভেবে যে হয়তো আমার এই জীবন-কাহিনী আমারই মতো কঠিন পরিবেশে পড়া সাধারণ মানুষকে বেশ খানিকটা প্রেরণা ও উৎসাহ দিতে পারে।

'আমার কথাটি ফুরাল!'